

ইতিহাস ও মামাজিক বিজ্ঞান

অনুমন্ত্রনী পার্ট

মন্ত্রম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



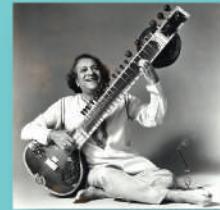
ইন্দিরা গান্ধী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী



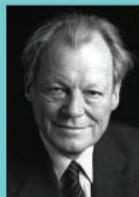
জেনারেল স্যাম মানেকশন
ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান



এডওয়ার্ড কেনেডি
আমেরিকান সিনেটর



পভিত্ত রাবিশঙ্কর
ভারতীয় সেতুবন্দনক ও সঙ্গীতশিল্পী



জেরাল্ড রাফার্ট
চ্যাঙ্কেলর
জামিন কেডারেলে বিপুর্বিক



আলেক্স কোসভিজন
রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী



মার্শাল টিটো
যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট



আন্দ্রে মালোরো
ফ্রাসি স্টেথক ও রাজনীতিবিদ



জে.এফ.আর. জানকী
ভারতীয় সেনাবাহিনীর
লেফটেন্যান্ট জেনারেল



সিডনি শনবার্গ
আমেরিকান সাংবাদিক



এলেন গিন্সবার্গ
আমেরিকান কবি



সায়াম প্রিং
প্রিটিশ সাংবাদিক



উইলিয়াম এ. এস অর্ডারল্যান্ড
অস্ট্রেলিয়ান, বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী কয়েকজন বিদেশি বন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত এবং
২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অনুসন্ধানী পাঠ

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

আবুল মোমেন

অধ্যাপক স্বাধীন সেন

অধ্যাপক আকসাদুল আলম

ড. দেবাশীষ কুমার কুন্তু

ড. পারভীন জলী

ড. সুমেরা আহসান

মুহাম্মদ রফিকুল হাসান খান

সিদ্দিক বেলাল

উমা ভট্টাচার্য

বহিং বেপারী

সানজিদা আরা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২২

শিল্পনির্দেশনা

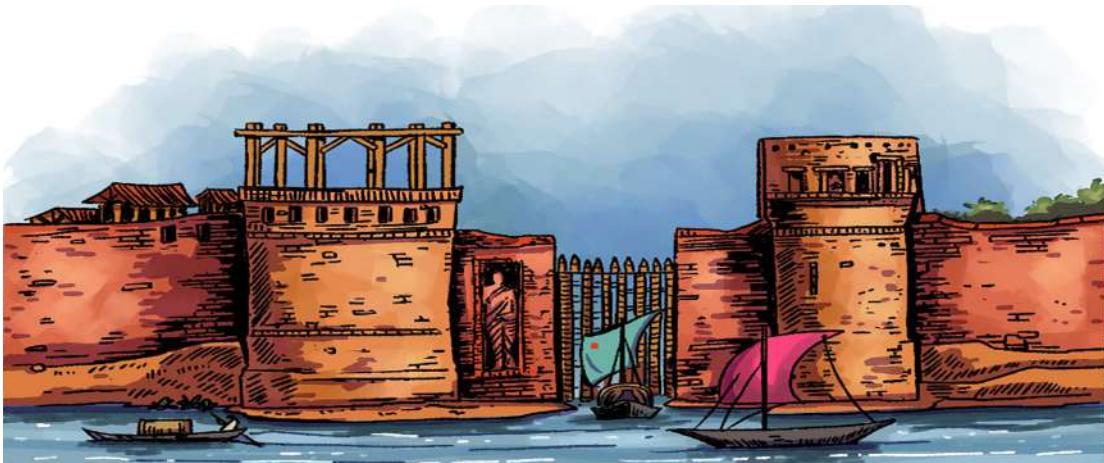
মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

ইউসুফ আলী নোটন

গ্রাফিক্স

মো: রুহল আমিন



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দুট। দুট পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রগালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্যে দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনৈতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ডিম্ব চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রাণে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিষ পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছ।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবণ্ণিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংক্রণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনোদ অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

নতুন বছরে নতুন শ্রেণিতে তোমাদের অভিনন্দন, স্বাগতম।

তোমাদের জন্য পড়ালেখার নতুন এক পদ্ধতি নিয়ে আমরা অপেক্ষায় আছি। এ পদ্ধতিতে তোমাদের আর পরীক্ষা এবং ভালো নম্বরের পিছনে ছুটতে হবে না। কেবল পরীক্ষার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্ন জানা আর সেসবের উত্তরের খোঁজে থাকতে হবে না। এখন থেকে উত্তর মুখস্থ করাও তোমাদের মূল কাজ নয়। বাবা-মায়েরও ভালো টিউটর, কোচিং সেটার, গাইড বই আর তোমাদের পরীক্ষা ও প্রশ্ন নিয়ে উদ্বেগে কাটাতে হবে না। অথবা অনেক টাকাও খরচ করতে হবে না।

আমরা জানি, তোমাদের প্রত্যেকের রয়েছে এক একটা সতেজ মন আর একটা করে খুবই সক্রিয় মন্তিষ্ঠ। তোমাদের কল্পনা শক্তি যেমন আছে, তেমনি আছে বুদ্ধি, তা খাটিয়ে পেয়ে যাও ভাবনার নানা পথ। মন আর মন্তিষ্ঠের মতো আরও কয়েকটা যোগ্যতা নিয়েই জন্মেছ সবাই। এগুলোর কথা বিশেষভাবে বলতে চাই। বলছি মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তির কথা। তোমরা আগেই জেনেছ আমাদের সবার আছে পাঁচটি করে বিশেষ প্রত্যঙ্গ- চোখ, কান, নাক, জিহ্বা আর তক। এগুলো ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। চোখ দিয়ে আমরা দেখি, এ হলো দৃষ্টিশক্তি, আর এটিকে বলি দর্শনেন্দ্রীয়। তেমনি কানে শুনি, এটি শ্রবণেন্দ্রীয়, নাক দিয়ে শুকি বা ঘ্রাণ নেই, এটি ঘ্রাণেন্দ্রীয়। জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করি, এটি স্বাদেন্দ্রীয়; আর তক দিয়ে স্পর্শ করি, এটি স্পর্শেন্দ্রীয়। কিছু চিনতে, বুঝতে, জানতে এগুলো আমাদের সহায়তা করে। তাই ইন্দ্রিয়গুলো এত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ।

এতসব সম্পদ মিলিয়ে তোমাদের প্রত্যেকের আছে-

অফুরন্ত প্রাণশক্তি

সীমাহীন কৌতুহল

আনন্দ পাওয়ার অসীম ক্ষমতা এবং

বিস্মিত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা।

আধুনিক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পরীক্ষা আর উত্তর মুখস্থ করার যে চাপ, তাতে তোমাদের এসব স্বাভাবিক ক্ষমতার বিকাশ ব্যাহত হয়। শিক্ষায় বরং শিক্ষার্থীদের এই ক্ষমতাগুলোকেই কাজে লাগানো দরকার, তাতেই ভালো ফল মিলবে।

এ থেকে তোমাদের নিজেদের কাজ সম্পর্কে একটু ধারণা নিশ্চয় পেয়ে যাচ্ছ। হাঁ এই ব্যবস্থায় তোমরা বেশ স্বাধীনতা পাচ্ছ। তবে ভুলো না, স্বাধীনতা ভোগ করতে হলে দায়িত্বও নিতে হয়। আচ্ছা, পড়ালেখাটা তো তোমার নিজেরই কাজ, নিজের জন্যই। তো নিজের কাজ নিজে করবে, এত খুব ভালো কথা।

তবে আসল কথা হলো, কোনো কাজে যখন নিজেই সফল হবে, তাতে আনন্দ যে কত বেশি তা নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারো। তাই নতুন পথে শিক্ষা হবে আনন্দময় যাত্রা, পথচলা। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে- যাত্রাপথের আনন্দগান। শিক্ষা হলো আনন্দগান সেই অভিযান্ত্রা- যেন গান করতে হবে এত খুব ভালো কথা।

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে মাত্রই উঠেছ। অভিজ্ঞতার বুলিতে রয়েছে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ। নতুন শ্রেণির পাঠের অনেক কিছুই হবে নতুন, অনেকটা অজানা। তবে অজানা আর নতুন বলেই তো এ পথচলাটা হবে অভিযানের মতো। পথে যে চ্যালেঞ্জ থাকবে সেগুলো পেরোনোর অভিজ্ঞতা থেকে যেমন অনেক কিছু জানবে, শিখবে, করবে, তেমনি পাবে অফুরন্ত আনন্দ।

অথচ এর জন্য বাড়তি কোনো খরচ লাগবে না। কারণ, চ্যালেঞ্জ মোকবিলার জন্য তোমাদের ভাঁড়ারে আছে নিজস্ব শক্তিশালী হাতিয়ার- কৌতুহল, বিস্ময়বোধ, প্রাণশক্তি এবং আনন্দিত হওয়ার ক্ষমতা। ইন্দ্রিয়গুলো এতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। আর মজা হলো এগুলো টাকাপয়সার মতো নয়, ব্যবহারে খরচ না হয়ে বরং বাড়ে। কারণ, এসবই তোমার মনের সম্পদ, তুমি যত চৰ্চা করবে, ততই এগুলো ব্যক্তিকে থাকবে, কাজে হবে দক্ষ। বরং এগুলোর প্রেরণায় তোমাদের নতুন নতুন ক্ষমতার প্রকাশ ঘটবে। প্রথম ডাক পড়বে বুদ্ধির। নিজেদের বুদ্ধি খাটাতে হবে, ভাবতে হবে, আবার ভাবতে গেলে যুক্তির প্রয়োজন। এ হলো চৰ্চার বিষয়- বুদ্ধি খাটালে তা আরও বাড়বে, দেখবে কোনো কোনো গাছের ডাল-পাতা হাঁটে দিলে গাছটি বাড়ে ভালো, ফলও দেয় বেশি। তোমাদের চাই বুদ্ধিকে খাটানো, যুক্তিতে শান দেওয়া। আর ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রাখতে হবে, তাতে এগুলোয় দক্ষতাও বাড়তে পারবে।

এভাবে অজানাকে জয় করবে, অক্ষণাকে আলো জ্বালিয়ে চলতে চলতে বিস্ময়ে-আনন্দে মজে কখন যে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে টেরও পাবে না। তবে শুরু হোক এই জয়যাত্রা!

সূচিপত্র

নগর সভ্যতার উত্থান-পতন: দক্ষিণ এশিয়ায় মানুষের
জীবন, অর্থনীতি ও পরিচয়ের রূপান্তর

১-৩১

সান্তানের বিষ্টার, নগর-রাষ্ট্র আর বৈচিত্র্য: পরিচয়, ভাষা,
জীবনের অবিরাম বদল

৩২-৭৭

আঞ্চলিক পরিচয়, চাষাবাদের বিষ্টার এবং তৃতীয়
নগরায়ণ: যোগাযোগ, মিশ্রণ আর প্রতিযোগিতার পর্ব

৭৮-১০৯

সম্পর্ক, মিশ্রণ ও নতুন ধারণা : সুলতানি আমল ও বাংলা

১১০-১২৪



নগর সভ্যতার উত্থান-পতন: দক্ষিণ এশিয়ায় মানুষের জীবন, অর্থনীতি ও পরিচয়ের রূপান্তর

বিভিন্ন স্থানে সমাজ, জীবন ও বসতির ভিন্নতা আর সম্পর্ক

দক্ষিণ এশিয়া বলতে আমরা এখন ভারতীয় উপমহাদেশকেই বুঝে থাকি। তোমরা পিরামিডের কথা পড়েছ, উর নগরের নাম পড়েছ, গ্রিক ও রোমান বিভিন্ন নগর, স্থাপত্য ও সমাজের কথা পড়েছ। একটা সময় পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, ভারত উপমহাদেশের মানুষ অতীতে মেসোপটেমিয়া, মিসর কিংবা গ্রিক ও রোমানদের মতন বড় বড় শহর তৈরি করতে পারে নি। পরিকল্পনা করে রাস্তা ঘাট, মানুষের থাকার জন্য পাকা বাড়ি, দালান-কোঠা, শহর ঘেরা উঁচু দেয়াল তৈরি করার মতন সামর্থ্য ভারত উপমহাদেশের মানুষ অর্জন করতে পারে নি। এমন একটা ধারণা ছিল। সেই ধারণা বদলে গিয়েছিল ১৯২০-এর দশকে। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে বর্তমান পাকিস্তানে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এমন দুটি স্থান খনন করলেন যেখানে পরিকল্পিতভাবে তৈরি রাস্তা, বাড়ি, মানাগার, গোলাঘরসহ অনেক স্থাপনা খুঁজে পাওয়া গেল। আলাদা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা অংশ আর প্রাচীরের বাইরের একটা অংশ মিলিয়ে বিরাট দুটো নগরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করলেন প্রত্নতত্ত্ববিদগণ। এই নগর দুটি হলো: মহেনজোদারো আর হরপ্ত্রা।

তারপরে একই সময়ের আরও অনেক এমন নগরের ধ্বংসাবশেষ ধীরে ধীরে বর্তমান ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকের গুজরাট, হরিয়ানা, পাঞ্জাব আর পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে খুঁজে পাওয়া গেল। এখনও অনেক নতুন নতুন এমন স্থান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। হরপ্ত্রা-মহেনজোদারোসহ অনেকগুলো এমন স্থান সিন্ধু নদী অববাহিকায় অবস্থিত। এজন্য এই সভ্যতার নাম হলো সিন্ধু সভ্যতা। আবার প্রথম আবিস্কৃত প্রত্নস্থানের নাম অনুসারে কেউ কেউ এই সভ্যতাকে হরপ্ত্রা সভ্যতাও বলে থাকেন। পরে দেখা গেল সিন্ধু নদীর অববাহিকার বাইরেও বিশাল এক অঞ্চলজুড়ে এই সভ্যতার নানা নগর, ছোট ছোট বসতি, গ্রাম-ধরনের বসতি, বাণিজ্যকেন্দ্র, বন্দর, নানা শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র ছড়িয়ে রয়েছে।

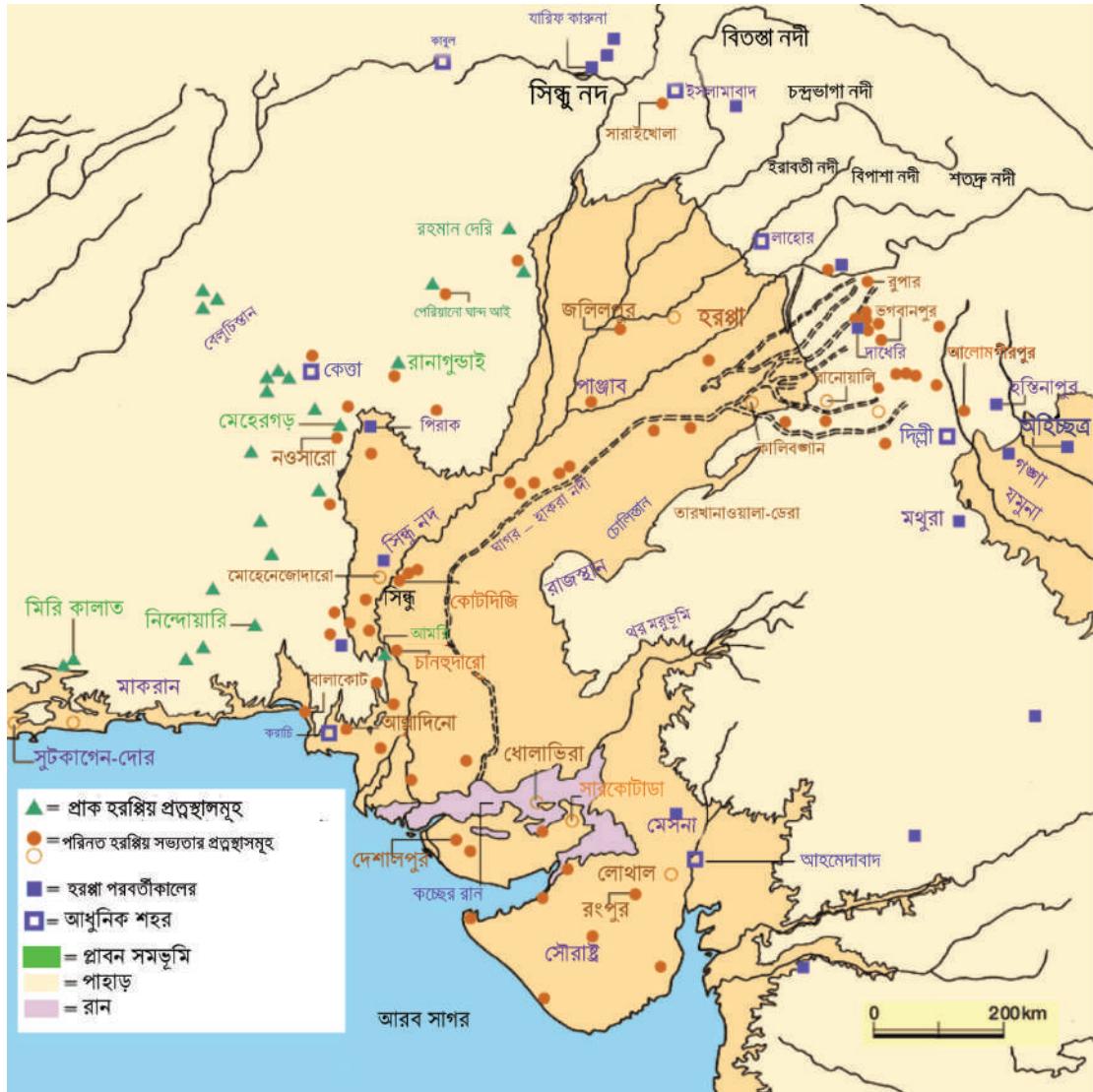
প্রথম দিকের গবেষকগণ বললেন, এই নতুন আবিস্কৃত সভ্যতার নগরগুলোর পতন হয়েছে আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে। পরের নানা গবেষণায় দেখা গেল যে, অনেক বসতি আস্তে আস্তে গ্রাম বা কৃষিকেন্দ্রিক কেন্দ্র থেকে রূপান্তরিত হতে হতে ধীরে ধীরে বড় বড় নগরের বিকাশ হয়েছে। তাই হরপ্ত্রা সভ্যতার সময়কালকে কয়েকটি পর্বে বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

আরও দুটো বিষয় তোমরা জানলে মজা পাবে:

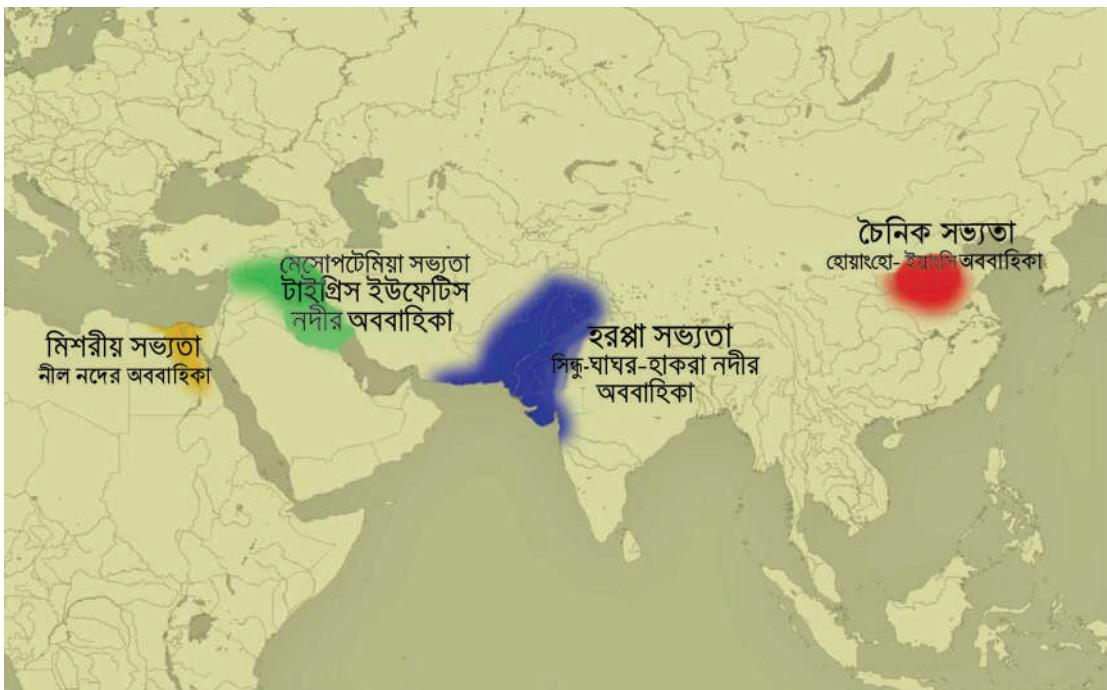
এক. হরপ্ত্রা সভ্যতার বসতিগুলো (নগর ও অন্যান্য ধরনের বসতি) বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশে অবস্থিত। ভারতের মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে উত্তর প্রদেশ অব্দি, কাশ্মীরের পাহাড় এলাকায়, আরব সাগরের উপকূলে, আফগানিস্তানের শুক্র এলাকায়, রাজস্থানের মরুভূমিতে, পাকিস্তানের বেলুচিস্থান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শুক্র, পাহাড় ও নদী থেকে দূরের ভূপ্লাটিক এলাকা। বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপে, পরিবেশে, জলবায়ুতে এই সভ্যতার বিভিন্ন ধরনের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তাই হরপ্ত্রা সভ্যতাকে কেবল নদী প্রভাবিত সভ্যতা বলা ঠিক হবে না। যদিও নদী বিধৌত সমতলভূমিতে যে নব্যপ্রস্তরযুগীয় এবং হরপ্ত্রা-সভ্যতার আগের বসতিগুলো গড়ে উঠেছিল সেগুলো এই সভ্যতার পতনে ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

সমভূমি বা সমতলভূমি

সুবিস্তৃত মৃদু ঢাল যুক্ত সমতল ভূভাগকেই সমভূমি বা সমতলভূমি বলে। মোট স্থলভাগের ৫৩% হলো সমভূমি। সমভূমিতে কৃষিকাজ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সবচেয়ে উপযোগী পরিবেশ গড়ে ওঠে বলে সমভূমিতেই সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে।



হরাঞ্জা সভ্যতার বিভিন্ন নগরকেন্দ্র ও বসতি বিশাল একটি এলাকাজুড়ে গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু নদী অববাহিকা ছাড়াও, ঘাঘর-হাকরা নামের আরেকটি নদীর অববাহিকাজুড়ে বর্তমান ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ আর পাকিস্তানের পূর্বাংশ মিলে যে-অঞ্চল, সেখানে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। আফগানিস্তানেও এই সভ্যতার কেন্দ্রের উপস্থিতি ছিল। এই মানচিত্রে ওই অঞ্চলের হরাঞ্জা সভ্যতার প্রধান নগরকেন্দ্রগুলো আর প্রথমদিকের কৃষিভিত্তিক বসতিগুলো দেখানো হয়েছে।



হরপ্তা সভ্যতার সঙ্গে সমসাময়িক নীল নদীর অববাহিকায় বিকশিত মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস-ইউফেটেস নদীর অববাহিকায় মেসোপটেমীয় সভ্যতা, চীনের হোয়াং হো নদীর অববাহিকার সভ্যতার দূরত্ব ও বিস্তার বোৰাৰ জন্য মানচিত্ৰ।

কিন্তু কেবল চাষাবাদ করে ফলানো ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে বড় বড় নগর বা শহর তৈরি করা হয় নি। অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদনসহ আরও নানা ধরনের অর্থনৈতিক কাজ এই সভ্যতার বিকাশে ভূমিকা রেখেছিল। এই সভ্যতার বিভিন্ন বসতির বিরাট অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃতি হওয়ার পরিস্থিতি ও কারণ তৈরি করেছিল।

দুই আগেও আমরা জেনেছি যে, মানুষ ও মানব সমাজের অবস্থা বিভিন্ন স্থান ও কালে বিভিন্ন হয়। যখন ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাংশে হরপ্তা সভ্যতার নগর, মানুষ, সমাজ, জীবন বিরাজ করছে, তখনই ভারত উপমহাদেশের উত্তরে, দক্ষিণে এবং পূর্ব দিকে মানুষজন ভিন্ন ধরনের জীবন ধাপন করছে। ভিন্ন সমাজ ও আচার আচরণ অনুসরণ করছেন। অন্য উৎপাদন পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ হিলেন। কোথাও তখন নব্যপ্রস্তরযুগীয়, কোথাও তাম্রপ্রস্তরযুগীয়, কোথাও তখন মিশ্র উৎপাদন পদ্ধতি, সামাজিক গঠন আর বসতির ধরন বিরাজমান ছিল। মানুষে মানুষের সম্পর্কও ভিন্ন ছিল। মানুষ তখন সেসব স্থানে নগর তৈরি করেন নি। গ্রাম ছিল। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত বসতি ছিল। একেক স্থানের পরিবেশ, ভূপ্রকৃতি, খাদ্য উৎসের উপস্থিতি অনুপস্থিতির ভিত্তিতে গ্রাম বা বসতিগুলো ঘরবাড়ি, গবাদিপশু রাখার স্থান, কৃষিজমি বা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করার জায়গা নির্ধারিত হতো। তাহলে মনে রেখো, ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে আনুমানিক এখন থেকে ৪ হাজার ৫০০ থেকে ৫০০০ বছর আগে বসতির ধরন, জীবনযাপনের ধরন, খাদ্যাভ্যাসের ধরন, ঘরবাড়ির ধরন একরকম ছিল। মানুষজন পরিকল্পিত নগরে বসবাস করত। আবার, তখন ভারত উপমহাদেশের পূর্বদিকে, যেমন আমাদের বর্তমান বাংলাদেশে সমাজ, বসতি, উৎপাদন, অর্থনীতি আলাদা ছিল।

ভারত উপমহাদেশে সভ্যতার পতন

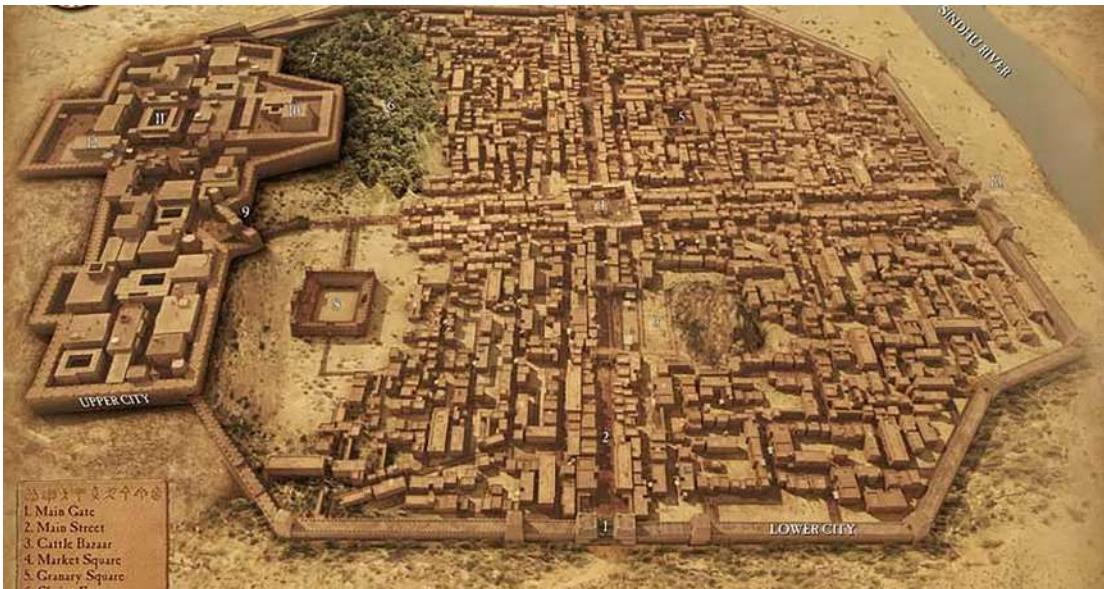
ইতিহাসে দেখা যায় সভ্যতার যেমন উত্থান ও বিকাশ ঘটে তেমনি পতন বা বিলুপ্তি এক অবধারিত প্রক্রিয়া। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সভ্যতা সূচনা থেকে ধারাবহিক বিকাশ লাভের একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে পতনের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছায়। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে মেসোপটেমীয় ও মিসরীয় সভ্যতার মতো ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধু নদীর তীরে গড়ে ওঠে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা। উৎপাদিত খাদ্য শস্য এবং ভোগ্যগুণ্য যখন নিজেদের চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত হতে শুরু করে মানব সভ্যতা তখন নতুন একটি যুগে প্রবেশ করে। নব্য-প্রস্তর যুগে মানুষ নিজের উৎপাদিত বাড়তি দ্রব্যের সঙ্গে অন্যের উৎপাদিত বাড়তি দ্রব্যের অদল-বদল করতে গিয়ে বিনিয় প্রথা চালু করেছিল। একপর্যায়ে মানুষ ধীরে ধীরে উদ্বৃত্ত বা বাড়তি পণ্য বেচা কেনার প্রক্রিয়া শুরু করে। এভাবে দ্রুমে নগর সভ্যতার উন্নত হয়। সরল গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক জীবনের বিপরীতে অপেক্ষাকৃত জটিল, বহুমুখী, উন্নত নগর জীবনের সূত্রপাত ঘটে তখন। দক্ষিণ এশিয়ায় এই সভ্যতার সবচাইতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে হরপ্লা, মহেঝোদারো, চানহুদারো, সুরকোতাদা, এবং কালিবজ্জান। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো সিন্ধু নদের সুফলগুলোকে উপজীব্য করেই আজ থেকে ৪৫০০-৪০০০ বছর আগে নগর-জীবনের লক্ষণযুক্ত হরপ্লা সভ্যতার যাত্রা শুরু হলেও তা পরিণত হয়ে ওঠে ৩৬০০ বছর আগে।



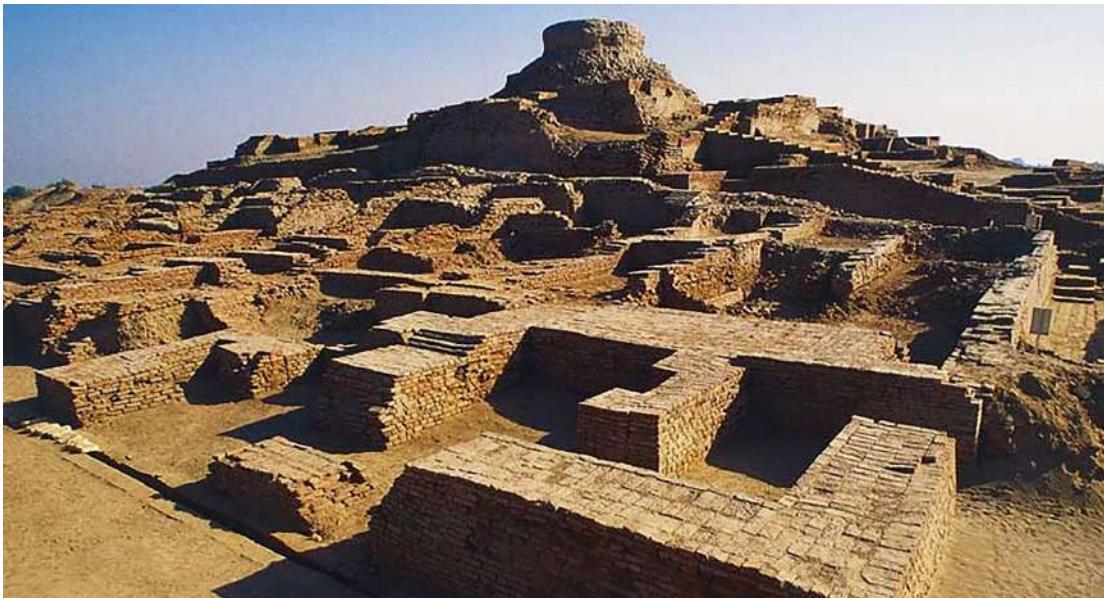
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরনের ধাতু, স্বল্প দামের পাথরসহ বিভিন্ন ধরনের জিনিস হরপ্লা সভ্যতার নগরগুলোতে স্থলপথ, নদীপথ ও সমুদ্রপথে আনা হতো। এই বাণিজ্যের যোগাযোগে হরপ্লা সভ্যতার নগরগুলোর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নতি ও বিকাশে বড় ভূমিকা রেখেছিল।

চলো সুন্দর নগর গড়ি:

দেখো তাহলে কত বছর আগের হরপ্পা সভ্যতাতে মানুষ কিন্তু এলোমেলোভাবে তাদের নগরকে গড়ে তোলেনি। তাদের নির্মাণ ছিল পরিকল্পিত। আছা তুমি যেখানে থাকো সেই শহর/ গ্রামকে আরও সুন্দর এবং পরিকল্পিতভাবে যদি গড়ে তুলতে চাও তাহলে সেখানের কী কী পরিবর্তন আনতে চাও তার একটি তালিকা তৈরি করো এবং সেই তালিকা অনুযায়ী মাটি/ ককশিট/ কাগজ ব্যবহার করে একটা মডেল তৈরি করে বন্ধুরা মিলে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করো।



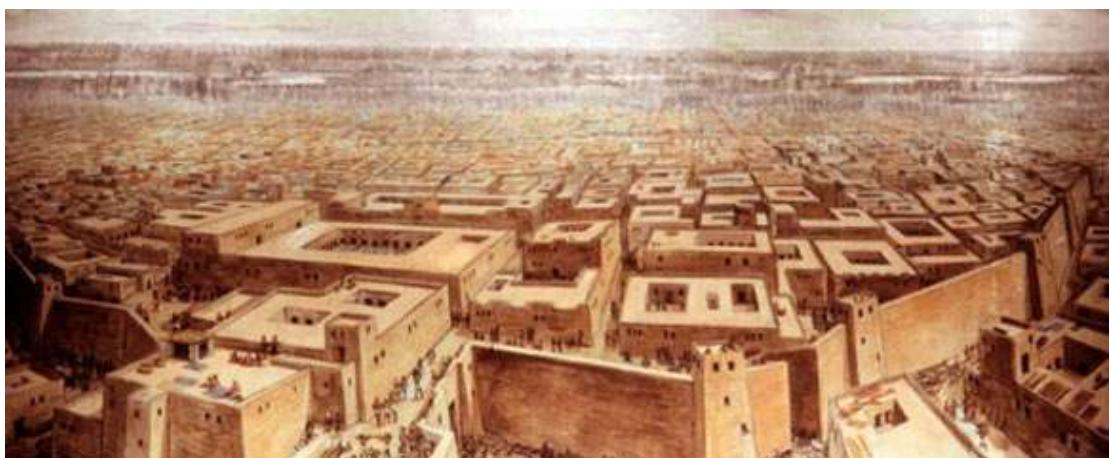
মোহেনজোদারো নগরটি তখন দেখতে কেমন ছিল? বিশ্লেষণ ও কল্পনা করে তৈরি করা হয়েছে
এই চিত্র।

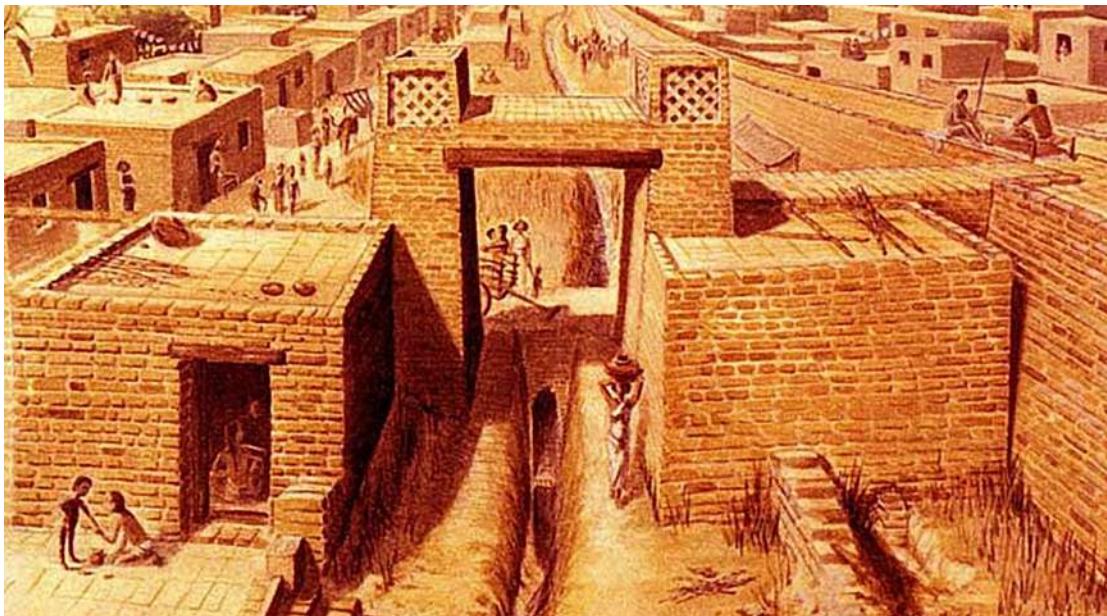


মোহেনজোদারো এখন দেখতে কেমন? প্রত্নতাত্ত্বিক খননে মোহেনজোদারোর যে খংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে তার কিছুটা এই ছবিতে দেখানো হয়েছে।



দাবা খেলার বোর্ডের সাদা-কালো চৌকো ঘরের মতন ঘর-বাড়ি ও রাস্তা তৈরি হতো। স্থাপত্যের খৎসাবশেষের একটি অংশের উপর থেকে তোলা ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে নগর-পরিকল্পনায় ঘরবাড়ি, রাস্তা ও পয়ঃনিকাশন ব্যবস্থা খুব যত্ন করে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু একটা সময় এই ব্যবস্থা নানা কারণে ব্যবস্থাপনার অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ করে আসা, মহামারি, খাদ্যাভাবসহ বিভিন্ন সমস্যার প্রভাবে ধীরে ধীরে এসব নগর বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল।





হরপ্লা নগরের একটি তোরণ, ড্রেন ও ঘরবাড়ি কেমন দেখতে ছিল? কল্পনা করে আঁকা হরপ্লা নগরের একটি অংশের চিত্র।

সিন্ধু নদীর অববাহিকার সভ্যতা

সিন্ধু সভ্যতার উত্তর উচ্চভূমি, মরুভূমি ও সমুদ্রবেষ্টিত উর্বর কৃষিজমিতে হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও সিন্ধু সভ্যতার নির্দশন আবিস্কৃত হয়েছে। আফগানিস্তানেও সিন্ধু সভ্যতার নির্দশন পাওয়া সিন্ধু সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রগুলো নদীতীরে আবিস্কৃত হলেও বালাকোটের মতো প্রাচীন সমুদ্রসৈকতেও কতকগুলো কেন্দ্র আবিস্কৃত হয়েছে। আবার দ্বীপেও এই সভ্যতার প্রাচীন কেন্দ্র আবিস্কৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ধোলাবিরার নাম করা যায়।

পাকিস্তানে হাকরা প্রগালি এবং ভারতের মরশুমি নদী ঘঘনের পরম্পর-প্রাচীন শুঙ্খ নদীখাতের প্রমাণ পাওয়া যায়। সিন্ধু সভ্যতার অনেক কেন্দ্র ঘঘন-হাকরা নদী অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রূপার, রাখিগড়ি, সোথি, কালিবঞ্চান ও গনওয়ারিওয়ালা। সিন্ধু নদীর অববাহিকা অতিক্রম করে হরপ্লা সভ্যতার বসতিগুলো এক বিশাল অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃতি ছিল ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম থেকে শুরু করে উত্তর ভারত পর্যন্ত। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে সমুদ্র পর্যন্ত।

হরপ্লা সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে রাখিগড়ি, লোথাল, হরপ্লা, মহেঝেদারো, বালাকোট, নাগেশ্বর, ধোলাবিরা, গনেরিওয়ালা, ধোলাভিরা, কালিবঞ্চান, রাখিগড়ি, রূপার, লোথাল ইত্যাদি। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় ১,০৫২টি প্রাচীন নগর ও বসতি অঞ্চলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

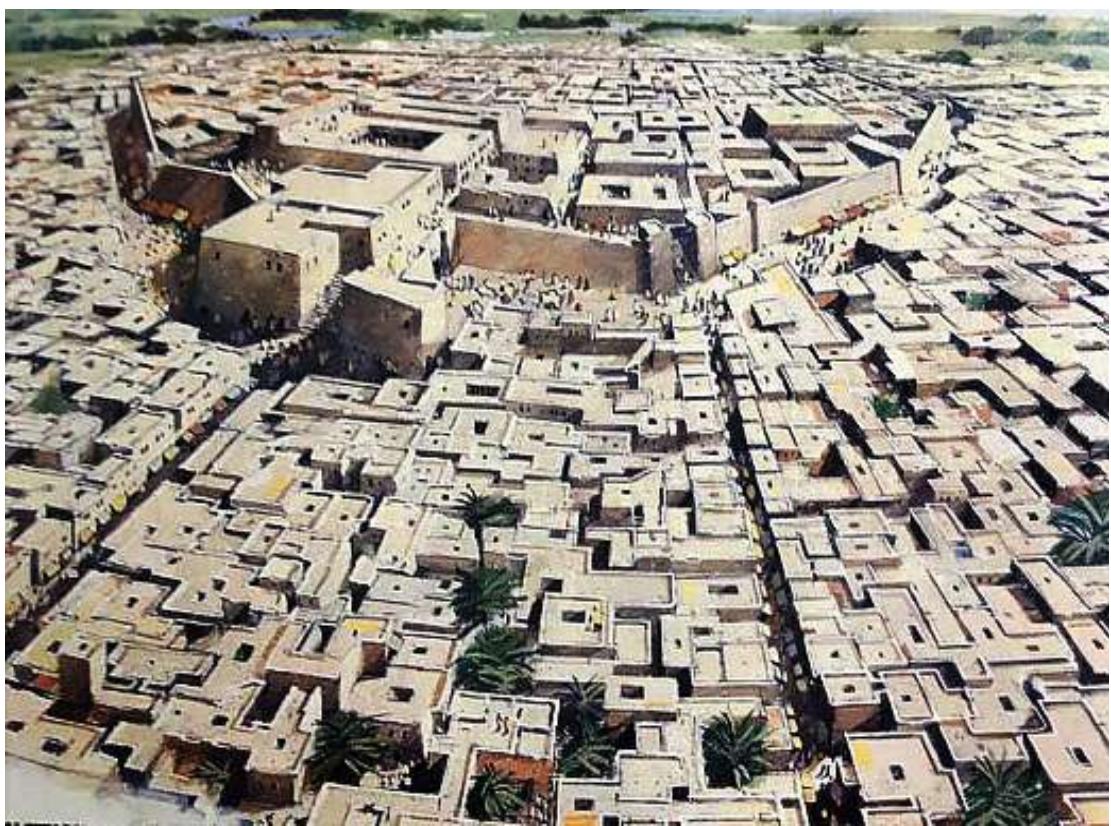
সিন্ধু নদ উপত্যকা

বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় নদী উপত্যকার মধ্যে সিন্ধু নদী উপত্যকাটি একটি। এই উপত্যকার বিস্তার ১১৬৫০০০ বর্গ কিলোমিটার। সিন্ধু নদের পাঁচটি উপনদী আছে বিতস্তা (বিলাম), বিপাশা (বিয়াস), শতদু (সাতলেজ), ইরাবতী (রাভি) ও চন্দ্রভাগা (চেনাব)। এই পাঁচ নদীর সমাহার থেকে পাঞ্চাব নামের উৎপত্তি হয়েছে। উপনদীগুলিসহ সিন্ধু উপত্যকার উত্তর অংশ, পাঞ্চাব অঞ্চল গঠন করে, যদিও সিন্ধু নিচের গতিপথ যা সিন্ধু নামে পরিচিত একটি বৃহৎ বদ্বীপে শেষ হয়।

উপরে আমরা অনেকগুলো সভ্যতার কথা এবং তাদের গড়ে ওঠার অঞ্চল সম্পর্কে জানলাম।

তাহলে চলো এখন নিচের ছকটি উপরে দেওয়া তথ্যের মাধ্যমে পূরণ করে ফেলি।

সভ্যতার নাম	গড়ে ওঠার স্থান



প্রাচীর ঘেরা মোহেনজোদারোর দুর্গ আর চারপাশের মানুষের বাড়িগুলো ও রাস্তা আজ থেকে আনুমানিক ৪৫০০ থেকে ৪১০০ বছর আগে দেখতে অনেকটা এমন ছিল। তোমরা নিশ্চয়ই দাবা খেলার বোর্ড দেখেছ? নগরের রাস্তা ও ঘরবাড়ি এমনভাবে পরিকল্পনা করে তৈরি করা হয়েছিল যে, রাস্তাগুলো একটি অন্যটির সঙ্গে সমকোণে ঘুর্ন ছিল। আর দাবার বোর্ডের যেমন চৌকো চৌকো বর্গ থাকে, ঠিক তেমনই ঘরবাড়িগুলো এক একেটা বর্গের মধ্যে তৈরি করা হতো।

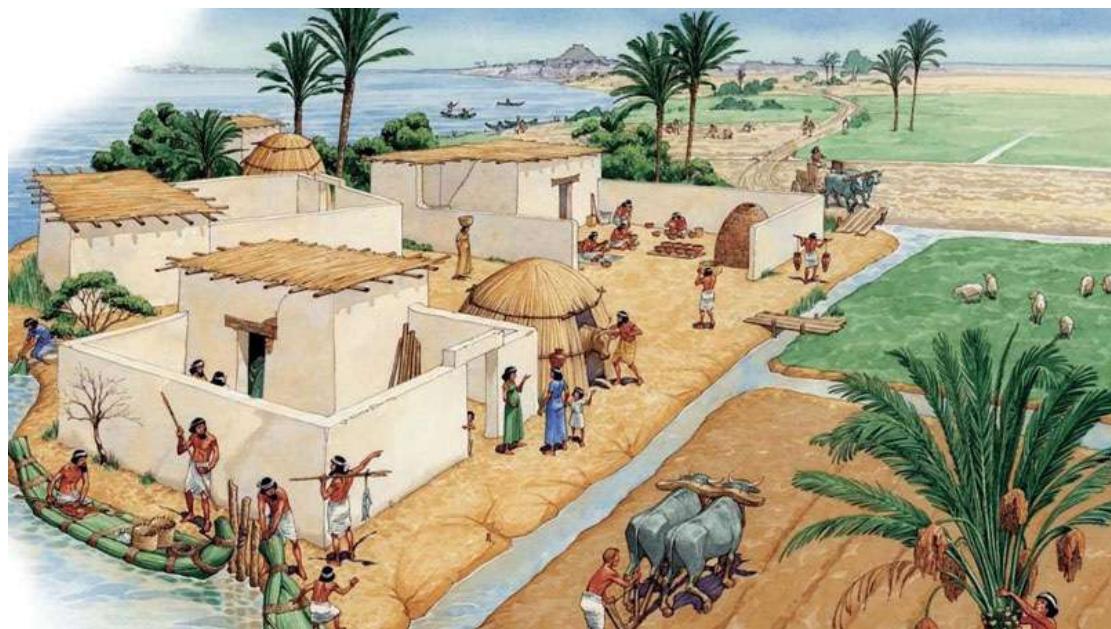
অন্যান্য বসতি: বন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র, শিল্প উৎপাদন, গ্রামীণ বসতি, মানুষের পরিচয়

সিন্ধু সভ্যতায় এক অভিজাত ও উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন নগরাঞ্চলীয় সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শহরগুলোই ছিল এই অঞ্চলের প্রাচীনতম নগরব্যবস্থা। নগর পরিকল্পনার উচ্চমান দেখে অনুমিত হয় নগরোন্নয়ন পরিকল্পনায় সম্পর্কে এই অঞ্চলের মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং এখানে একটি দক্ষ পৌর সরকারেরও অস্তিত্ব ছিল। এই সরকারব্যবস্থায় স্বাস্থ্যসচেতনতা যেমন গুরুত্ব পেতো, তেমনি নাগরিকদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের সুবিধা-অসুবিধার দিকেও নজর রাখা হতো। হরপ্লা সভ্যতার একই সঙ্গে নগর, বাণিজ্য কেন্দ্র ও গ্রামীণ বসতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত হরপ্লার সভ্যতার নির্দর্শন, কাঁচামাল, ভোগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যকেন্দ্র ও বাণিজ্যপথ চিহ্নিত করা হয়েছে।

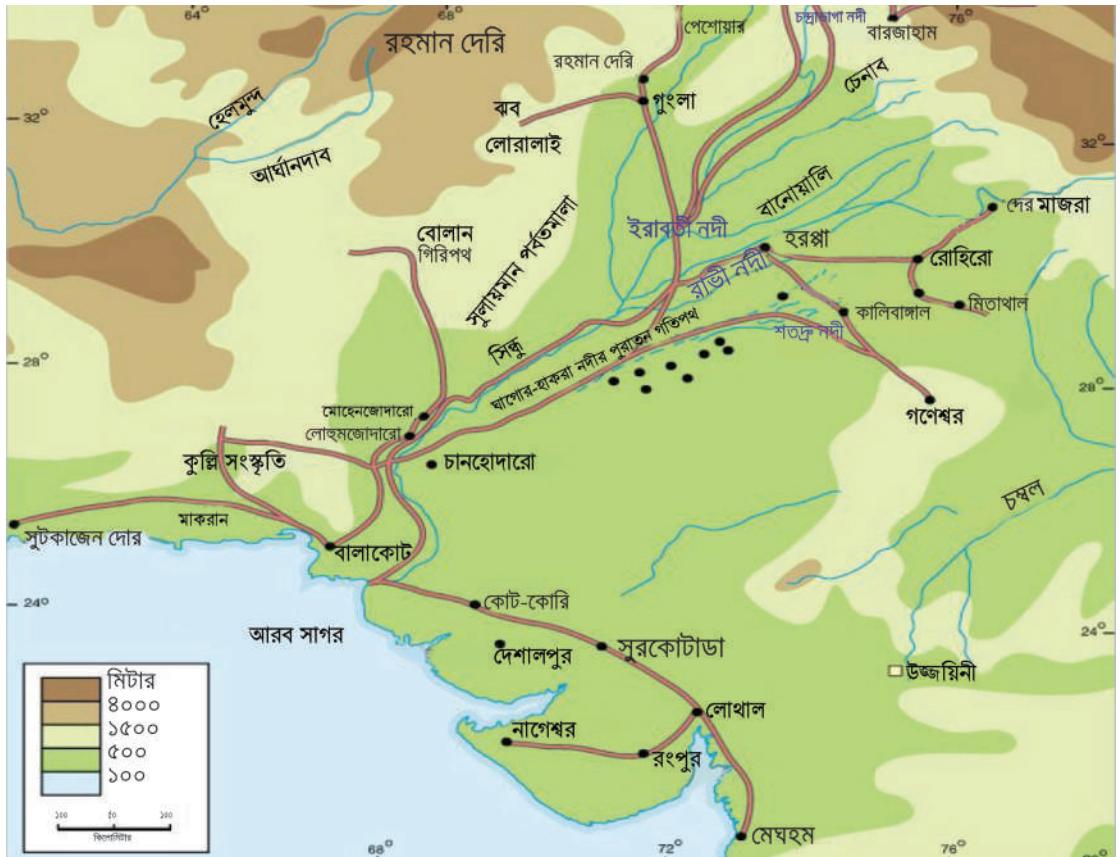
বাণিজ্য কেন্দ্র:

হরপ্লা সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল বাণিজ্য। হরপ্লা সভ্যতার যেমন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল তেমনি বহিঃবাণিজ্যও ছিল। বহিঃবাণিজ্যের মধ্যে মেসোপটেমীয়া, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল, তুর্কমেনিস্তানের খার্তুজ, বর্তমান ইরানের হিশার, সুসা, মাকরান উপকূল ও ওমান। অন্তর্বাণিজ্যের মধ্যে ছিল বেলুষ্টান, সিন্ধু, রাজস্থান, চোলিস্থান, পাঞ্জাব ও গুজরাট।

স্থল ও জল উভয় পথেই বাণিজ্য হতো। ধারণা করা হয়, স্থলপথে গরুর গাড়ি ও জল পথে নৌকা ও সাম্পান মাধ্যমে বাণিজ্য করা হতো। সিন্ধু সভ্যতার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লোথাল, ধোলাভিরা, সুরকেটাডা, দেশালপুর, নাগেশ্বর, রংপুর, এই বন্দরগুলো দ্বারা হরপ্লা সভ্যতার মানুষ সুমেরীয়, মিসর, পারস্য উপকূল অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য করতো।



কেমন ছিল হরপ্লা সভ্যতার নগরের আশপাশে থাকা কোনো বসতি? বাড়িঘর, চাষাবাদ, নৌকায় করে যাতায়াত? হরপ্লা সভ্যতার বসতি ও নানা ধরনের কাজের একটি কাল্পনিক চিত্র।



হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন নগরগুলোর পরম্পরের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই বাণিজ্য নদীগত ও স্থলপথে চলতো। এমন যোগাযোগ পথের মানচিত্র।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত নির্দশনসমূহের আলোকে ধারণা করা হয়, এই অঞ্চলে উন্নত নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আধুনিক নগরসভ্যতার মতো সেখানে পরিকল্পিত বসবাসের পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনেও পরিকল্পনার ছাপ ফুটে ওঠে। হরপ্পার উন্নত ও বিকাশের সময়কালকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথাক্রমে:

প্রাক হরপ্পা পর্ব

(৩৫০০ -২৬০০ প্রাক সাধারণ অব্দ)

পরিণত হরপ্পা পর্ব

(২৬০০-১৯০০ প্রাক সাধারণ অব্দ)

হরপ্পা পরবর্তী পর্ব

(১৯০০ / ১৭০০ প্রাক সাধারণ অব্দ থেকে পরবর্তী সময়কাল)

প্রাক-হরপ্পীয় সময়

নিকটবর্তী ইরাবতী নদীর নামে নামাঞ্চিত আদি হরপ্পা ইরাবতী পর্বের সময়কাল ৩৩০০ প্রাক সাধারণ অব্দ থেকে ২৮০০ প্রাক সাধারণ অব্দ। এটি পশ্চিমে হাকরা-ঘঘর নদী উপত্যকার হাকরা পর্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

পাকিস্তানের রেহমান খেরি ও আমরিতে পূর্ণবর্ধিত পর্বের প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতির নির্দর্শন পাওয়া গেছে। কোট দিজি (হরপ্লা দুই) এমন একটি যুগের প্রতিনিধি যা পূর্ণবর্ধিত যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করে। এই স্তরে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের একটি প্রধান কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল এবং নাগরিক জীবনযাত্রার মানও ক্রমশ উন্নত হচ্ছিল। এই শহরের আরও একটি শহর ভারতে হাকরা নদীর তীরে কালিবঙ্গানে পাওয়া গেছে।

অন্যান্য আঞ্চলিক সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। লাপিস লাজুলি ও অন্যান্য রত্ন প্রস্তুতকারক উপাদান দূর থেকে আমদানি করা হতো। গ্রামবাসীরা এই সময় মটর, তিল, খেজুর ও তুলার চাষ করত। এই সময় মহিষ পোষ মানানো শুরু হয়। ২৬০০ প্রাক সাধারণ অব্দ নাগাদ হরপ্লা বৃহৎ এক নগরকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সময়কাল থেকেই পূর্ণবর্ধিত হরপ্লা সভ্যতার সূচনা।

পরিণত হরপ্লা সময়

২৬০০ প্রাক সাধারণ অব্দ নাগাদ আদি হরপ্লা সভ্যতার অধিবাসীরা একাধিক বৃহৎ নগর কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। এই ধরনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নগর হল আধুনিক পাকিস্তানের হরপ্লা, গনেরিওয়ালা, মোহেনজোদারো এবং ভারতের ধোলাভিরা, কালিবঙ্গান, রাখিগড়ি, বুগার, লোথাল ইত্যাদি। সিক্রি ও তার উপনদীগুলির অববাহিকায় মোট ১,০৫২টি প্রাচীন নগর ও বসতি অঞ্চলের স্ফীন পাওয়া গিয়েছে।

হরপ্লা সভ্যতার বৈশিষ্ট্যবলি

নগর পরিকল্পনা: হরপ্লা ও মোহেনজোদারোর নগরসমূহের গঠনশৈলী দেখে ধারণা করা হয় যে এই সভ্যতার জনগোষ্ঠী গ্রামীণ জীবন পরিত্যাগ করে সুসংগঠিত নগরের পতন ঘটিয়েছিল। প্রাচীন পৃথিবীর প্রাচীনতম নগর পরিকল্পনার প্রকাশ ঘটেছিল হরপ্লা-মোহেনজোদারোর নগরবিন্যাসের মধ্য দিয়ে।

ক. রাস্তা:

দুই নগরের সব রাস্তাই ছিল সোজা। প্রধান সড়ক ৩৫ ফুট চওড়া ছিল। সবচেয়ে অপরিসর রাস্তা ছিল ১০ ফুট প্রশস্ত। ছোট ছোট গলিপথ ছিল ৫ ফুট চওড়া। বিভিন্ন ধরনের রাস্তার এই মাপ তারা বজায় রাখতো।

খ. পানি সরবরাহ:

হরপ্লা ও মোহেনজোদারো শহরের শাসকবৃন্দ নগরবাসীদের পানি সরবরাহের জন্য পথের ধারে কৃপ খনন করত। অনেক বাড়ির উঠোনের সামনেও কৃপ ছিল।

গ. পয়ঃপ্রণালি:

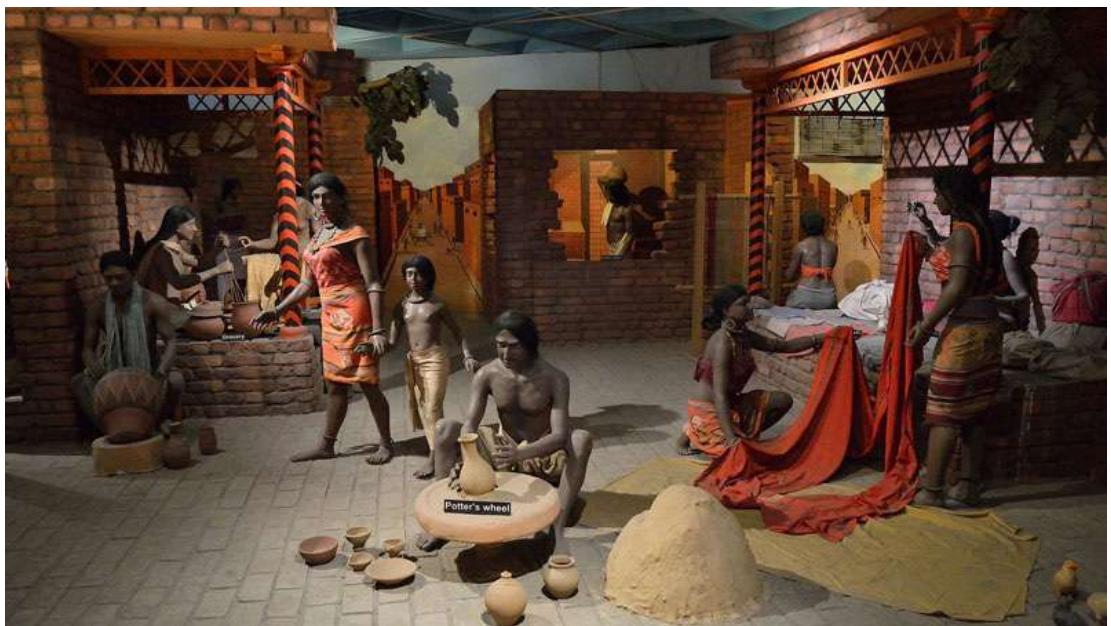
নগর পরিকল্পনাকারী নগরজীবনকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মাটির নিচে সুরক্ষিত পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে সর্বসাধারণের এবং ব্যক্তিগত পয়ঃপ্রণালির অস্তিত্ব ছিল। নগরায়ণের এই আধুনিক ধারণা অন্য কোনো প্রাচীন সভ্যতায় দেখা যায়নি। এছাড়া নগরের প্রতিটি বাড়িতে একটি করে স্নানাগার এবং ময়লা পানি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ডেনের ব্যবস্থা ছিল। এই ডেনগুলো প্রধান পয়ঃপ্রণালির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ডাস্টবিনের ব্যবস্থা:

হরপ্লা ও মোহেনজোদারো নগরের কর্তৃপক্ষ রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে পথের পাশে ডাস্টবিন রাখার ব্যবস্থা করতেন।



হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পাওয়া মানববসতির একাংশ



হরপ্পা সভ্যতার কোনো একটি নগরের দোকানপাট, মৃৎপাত্র তৈরি, ও চিত্র তৈরি করা কাপড়



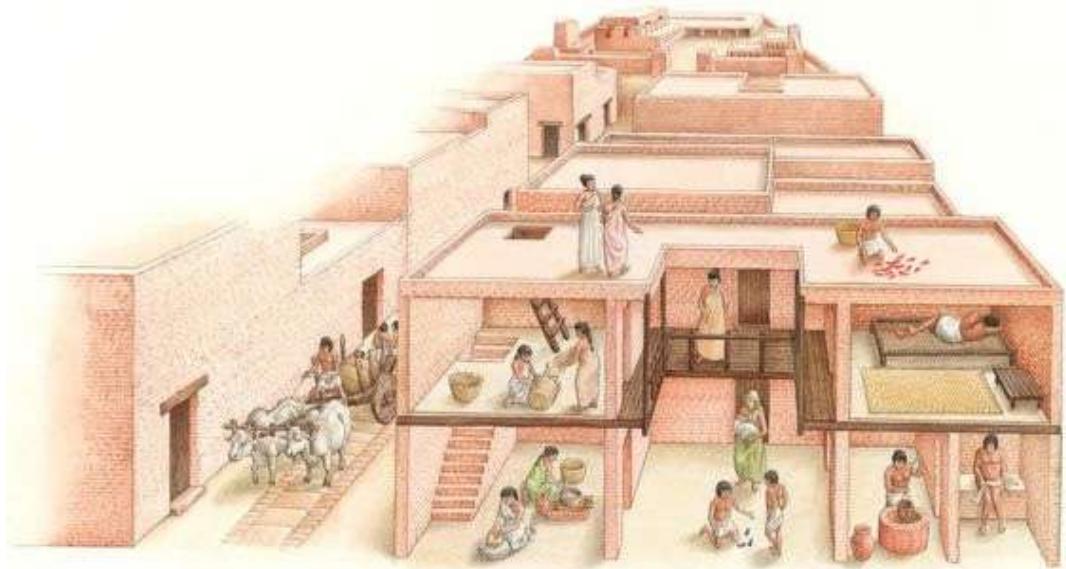
মোহেনজোদারো নগরের একটি রাস্তা।



মোহেনজোদারোর নগরের বিখ্যাত বৃহৎ স্থানগার



পরিকল্পিত পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালি



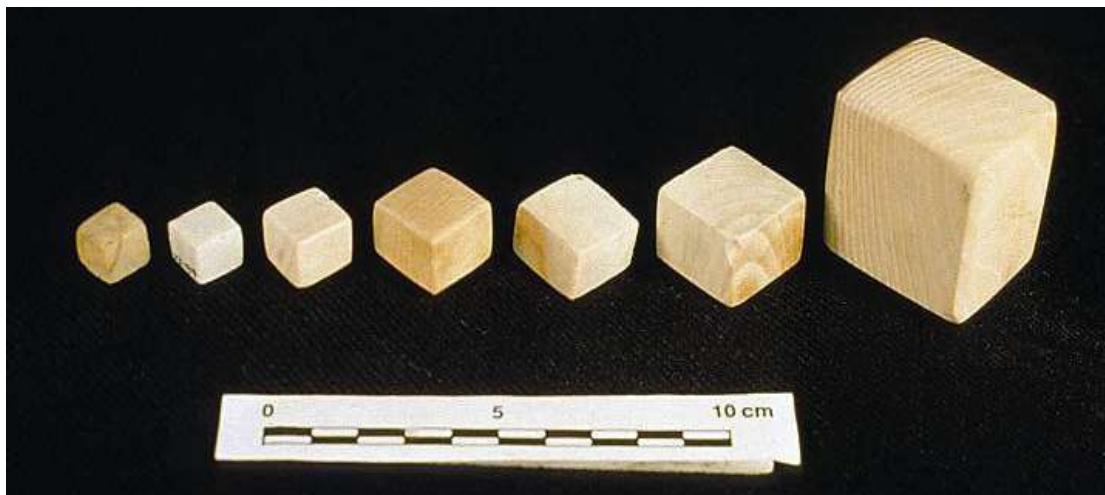
মহেনজোদারোর রাস্তা আর রাস্তার পাশের ঘরবাড়ি। খননে খুঁজে পাওয়া স্থাপত্যের খংসাবশেষের ভিত্তিতে কাল্পনিক চিত্র

পরিমাপ পদ্ধতি :

ক্রয় ও বিক্রয়ে দ্রব্যাদির সঠিক পরিমাপের স্বার্থে হরপ্লা ও মহেনজোদারো নগরের মানুষ ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতি উন্ভাবন করেছিল।

বাটখারা:

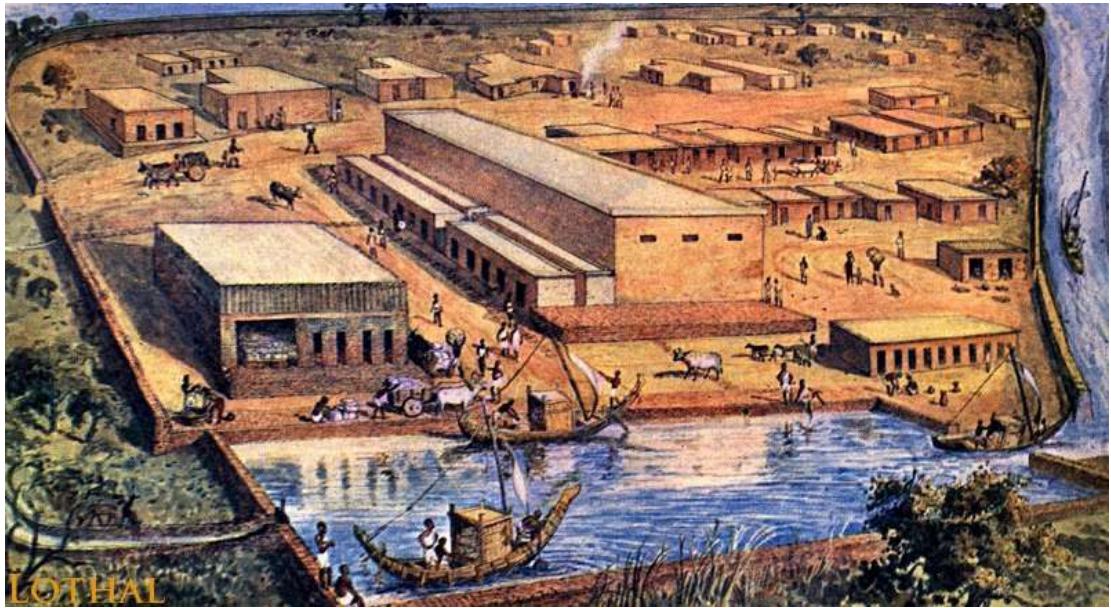
দ্রব্যাদি ওজনের জন্য নগরের অধিবাসীরা বিভিন্ন পরিমাপের বাটখারা ব্যবহার করত। সবচেয়ে ক্ষুদ্র বাটখারার ওজন ছিল ০.৮৭৫ গ্রাম এবং বৃহৎ বাটখারার ওজন ছিল ১০.৯৭০ গ্রাম।



বিভিন্ন ধরনের ওজন মাপার বাটখারা

আমরা তো বিভিন্ন ছবি ও তথ্যের সাহায্যে সিক্কু ও হরপ্লা সভ্যতার নানা দিক জানলাম। এখন চলো একটা আমরা মজার কাজ করি। যেকোনো একটি বিষয় যা এই সভ্যতাগুলোকে উল্লেখযোগ্য করে তুলেছিল সেরকম একটি বিষয় নিয়ে পোস্টার বানিয়ে বন্ধুরা মিলে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করি।

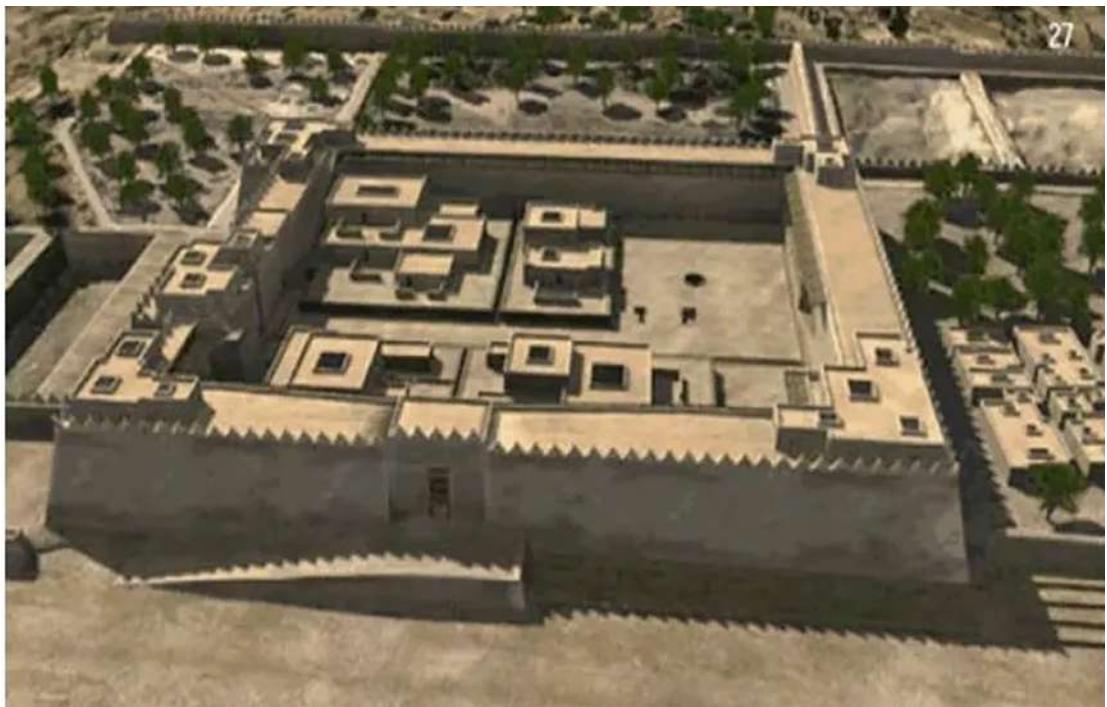




আরব সাগরের তীরে লোথাল ছিল হরপ্লা সভ্যতার আরেকটা নগর। এই নগরটি ছিল একটি সমুদ্র বন্দর। শিল্পীর চোখে সেই সময়ের লোথাল।

নদীর/নদের গতিপথ পরিবর্তন

প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কারণে নদী যদি তার স্বাভাবিক চলার পথ পরিবর্তন করে, তখন সেই অবস্থাকে নদীর গতিপথ পরিবর্তন বলা হয়।



ধোলাবিরা ছিল আরেকটি নগরকেন্দ্র। সেটি দেখতে কেমন ছিল? প্রাচীর ঘেরা সুরক্ষিত অংশ এখানে দেখানো হয়েছে।

শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও অলংকার শিল্পের দক্ষতা হরপ্পা ও মোহেনজোদারোর সমৃদ্ধির নির্দেশ করে। সিন্ধু সভ্যতায় পাথর ও ৰোঞ্জের তৈরি প্রচুর ভাস্কর্য পাওয়া গিয়েছে। তাদের পাথুরে ভাস্কর্যের কয়েকটি উদাহরণ এখানে সংযোজিত হলো। এতে তাদের ভাস্কর্য-শিল্পে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন : চুনাপাথরের মহেনজোদারোতে পাওয়া গেছে। এটি ছিল নরম পাথরের তৈরি। দাঢ়ি, চোখ, নাক, কান প্রভৃতি নির্মাণে ভাস্করণ বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন।



চুনাপাথরের মূর্তি [প্রধান পুরোহিত/শাসক?]



হরপ্পা সভ্যতার মানুষদের ব্যবহৃত পোড়ামাটির, স্বল্পমূল্যের পুঁতি, ধাতুর হাতের চুরি, গলার হারসহ নানা ধরনের অলংকার

এছাড়া সিন্ধু সভ্যতার স্বর্ণকারণ অপূর্ব নকশায় অলংকার তৈরিতে দক্ষ ছিল। তারা স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ও ৰোঞ্জের অলংকার তৈরি করত। তাদের তৈরি অলংকারের মধ্যে আংটি, বালা, নাকফুল, নেকলেস, কানের দুল, বাজুবন্ধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।



হরপ্তা ও মোহেনজোদারোতে প্রাপ্ত পোড়ামাটিতে তৈরি খেলনা জীবজন্তুর মূর্তি ও চাকতি

মোহেনজোদারোতে বেশ কিছু ব্রোঞ্জের পশু-মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে শিল্পমানের দিক থেকে উৎকৃষ্ট হলো ঘাঁড় ও ছাগলের মূর্তি। হরপ্তা ও মোহেনজোদারোতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির (Terracotta) ভাস্কর্যও এ সভ্যতার শিল্প-উৎকর্ষের অন্যতম নির্দশন হিসেবে বিবেচিত হয়। পোড়ামাটির উপর ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।

হরপ্তা ও মোহেনজোদারোতে পোড়ামাটিতে তৈরি যেসব জীবজন্তুর মূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে গরু, উদ্ধত ঘাঁড়, মহিষ, কুকুর, শুকর, হাতি, বানর ও পাখি উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত শিল্প মানের দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত ছিল।



হরপ্তায় মাটির তৈরি খেলনা গরুর গাড়ি



একটি নৌকার অনুকৃতি। পোড়ামাটিসতে তৈরি এই ছোট নৌকার আকার ও ধরন দেখে সেই সময়ের হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন নগর ও বসতির মধ্যে নদীপথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত নৌকা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

সামাজিক শ্রেণি:

মোহেনজোদারোর খননকাজের ফলে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, এখানে বসবাসকারী মানুষ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। ১. শিক্ষিত শ্রেণি, ২. যোদ্ধা, ৩. ব্যবসায়ী ও কারিগর এবং ৪. শ্রমজীবী শ্রেণি। শিক্ষিত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল পুরোহিত, চিকিৎসক, জ্যোতিষী এবং জাদুকর গোষ্ঠী।

খাদ্য :

নগরবাসীর খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন পশুর মাংস অন্তর্ভুক্ত ছিল; যেমন, গরু, ছাগল, শূকর, হাঁস, মুরগি, কচ্ছপ ইত্যাদি। তবে প্রধান খাদ্য ছিল গম। যব এবং খেজুরও তাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। তারা খাবার হিসেবে দুধও গ্রহণ করত। যদিও তেমন প্রমাণ মেলে না তবুও মনে হয় সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা সবজি এবং ফল খেতো।

অর্থনৈতিক অবস্থা:

সিন্ধু সভ্যতার জনগণ বিস্তৃত অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তুলেছিল। প্রস্তাত্বিক নির্দর্শন থেকে সিন্ধু উপত্যকায় গড়ে ওঠা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষি:

প্রধানত সিন্ধু সভ্যতার জনগণ ছিল কৃষিজীবী। প্রস্তাত্বিক নির্দর্শন থেকে ধারণা করা হয় এই সভ্যতার মূল উৎপাদিত শস্য ছিল গম, বার্লি এবং তুলা। কৃষিকাজে ঝাঁড় ব্যবহার করা হতো।

শিল্প:

সিন্ধু সভ্যতার কারিগররা বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করত। ধাতব শিল্প হিসেবে তামা ও ব্রোঞ্জের বিভিন্ন অস্ত্র ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তৈরি হতো। তবে সিন্ধু সভ্যতায় লোহা ব্যবহারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সিন্ধু সভ্যতায় বয়ন-শিল্পেরও বিকাশ ঘটেছিল। তারা তুলা ও পশম দিয়ে কাপড় বুনতে পারত। সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন নির্মাণকাজে কাঁচা এবং আগুনে পোড়ানো উভয় ধরনের ইটই ব্যবহার করা হতো। হরপ্পা ও মোহেনজোদারোতে অনেক ইটের ভাটা



আরেক ধরনের নৌকার মডেল বা অনুকৃতি। এমন মডেল থেকে হরপ্লা সভ্যতার বসবাসকারীদের জলপথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত নৌকা ও পরিবহন সম্পর্কে ধারণা করা যায়।



হরপ্লায় মাটির তৈরি খেলনা গবুর গাড়ি

সিন্ধু সভ্যতার করিগরগণ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প দ্রব্য তৈরি করত। সেগুলোর মধ্যে ছিল প্রচুর খেলনা। হরপ্লায় মাটির তৈরি দুই চাকার ফাঁড়ের খেলনা-গাড়ি পাওয়া গেছে। এছাড়াও পোড়ামাটির ও তামার এক্সাগাড়ি, পাথি প্রভৃতি নির্দশনের কথাও উল্লেখ করা যায়। অলংকরণ শোভিত গোলাকৃতির মৃৎপাত্র সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম কারিগরি দক্ষতার পরিচায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান- অনুসন্ধানী পাঠ

গড়ে উঠেছিল বলে ধারণা করা হয়। এসব ছাড়া এ সভ্যতায় হাতির দাঁতের চিরুনি, হাতির দাঁতের সুচ, কাঠের হাতলবিশিষ্ট তামা ও ব্রোঞ্জের আয়না, মৃৎপাত্র, সিল প্রভৃতি তৈরির ক্ষুদ্র শিল্পও গড়ে উঠেছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য:

সিন্ধু সভ্যতার কারিগরগণ পর্যাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করত। এসবের চাহিদা ভারতের বিভিন্ন অংশ ছাড়াও বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে নানা দেশের সঙ্গে এখনকার মানুষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভারতের উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট ও কাহিওয়ারের সাথে সিন্ধু সভ্যতার বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ মেলে এসব অঞ্চলে প্রাপ্ত ধাতব দ্রব্য, মৃৎপাত্র, অলংকার প্রভৃতি থেকে বহিঃবাণিজ্য হিসেবে পারস্য, আফগানিস্তান, মেসোপটেমিয়া ও মিসরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।



চারকেোণাকৃতির সিল মোহর

লিখন পদ্ধতি:

১৯২৫ সাধারণ অন্দের মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার ২৫০০টি সিলে চিত্রধর্মী লিপি পাওয়া গেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক, প্রয়োগিক এবং ভাষাবিদগণ এই লিপির পাঠোকার করতে পারেননি।

মৃৎপাত্র:

হরপ্লা ও মোহেনজোদারোতে কুমোরের চাকায় বিভিন্ন আকৃতির মাটির পাত্র তৈরি হতো। অলংকরণ শোভিত এ সমস্ত মৃৎপাত্র ব্যবহার করা হতো পানি, শস্য, লবণ প্রভৃতি সংরক্ষণের কাজে। লাল, কালো প্রভৃতি রঙের ব্যবহার করে মৃৎপাত্রগুলোকে উজ্জ্বল করা হতো।



বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্র। আকার দেখে তোমরা ধারণা করতে পারো এগুলোর ব্যবহারের ধরন?

কবর:

হরপ্লা সভ্যতায় মৃতদেহকে কবর দেওয়ার প্রচলন ছিল। হরপ্যা সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্নস্থান থেকে বিভিন্ন দ্রব্যাদিসহ কবর পাওয়া গেছে। হরপ্লা নগরের একটি কবরস্থানে অনেক কবর ও কঙ্কাল পাওয়া গেছে।



হরপ্লা সভ্যতার বসবাসকারী মৃতদেহ নানা ধরনের বস্তুসহ কবর দিত। এমন কঙ্কালসহ এমন কবর অনেক আবিস্কৃত হয়েছে। এমন কঙ্কাল বিশ্লেষণ করেই বিজ্ঞানীরা ওই সভ্যতার অধিবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও গড়ন সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছেন। হরপ্লা সভ্যতার বিভিন্ন দেহাবশেষের বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে এখানকার অধিবাসী স্থানীয় ও বর্তমান ইরান অঞ্চল থেকে আসা মানুষদের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছিল। তাদের সঙ্গে বর্তমান দক্ষিণ ভারতীয়দের মিল বেশি। ভাষাতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন, হরপ্লা সভ্যতার অধিবাসী দ্রাবিড়ীয় ভাষার কোনো একটি আদি রূপে কথা বলতেন। এদের প্রোটো-দ্রাবিড়ীয় প্রকারের ভাষা বলা হয়। অন্যদিকে, তোমরা আগেই পড়েছ যে, স্টেপ তৃণভূমি অঞ্চল থেকে বিভিন্ন দলে মানুষদের আসা শুরু হয় হরপ্লা সভ্যতার অবক্ষয় শুরুর পরে।



হরপ্তা সভ্যতায় বাণিজ্য, ও বিভিন্ন নগরের পরিচয় নির্ধারণকারী বিভিন্ন ধরনের সীলমোহর। এই সিলমোহর ও সিলমোহরে ব্যবহৃত হরফ বা চিত্রলিপিগুলো এখনো প্রাচৰতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদদের কাছে রহস্যময় রয়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে।

হরপ্তা সভ্যতার ক্রমিক অবনতি ও কারণ

সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রাচৰতত্ত্বিক উপাদান বা বস্তুর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রাচৰতত্ত্ববিদদের অনুমান, হরপ্তা সভ্যতা আনুমানিক ২৩০০ থেকে ১৭৫০ প্রাক সাধারণ অন্দের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। হরপ্তা সভ্যতা ছিল এক বিশাল প্রাণবন্ত সভ্যতা এবং এই প্রাণবন্ত সভ্যতা কী কারণে বিলুপ্ত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। দীর্ঘ ৬০০ বছর উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত অস্তিত্বের পর আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৫০ অন্দের কিছুকাল পরে এই সভ্যতার অবসান ঘটেছিল, এ কথা সর্বজনস্মীকৃত। এই সভ্যতার ধৰ্মসের কারণ সম্পর্কে পুরাতত্ত্ববিদ, ভূততত্ত্ববিদ, আবহাওয়া তত্ত্ববিদ এবং বিভিন্ন ইতিহাসবিদ বিভিন্ন মত প্রকাশ প্রকাশ করেছেন। এরা সকলেই বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিভিন্ন মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে আজ পর্যন্ত এমন কোনো তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়নি যার ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, কোনো একটি বিশেষ কারণে এই সুমহান সভ্যতার পতন ঘটেছিল। হরপ্তা সভ্যতার বিলুপ্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাদের কয়েকটি মৌলিক বিষয় মনে রাখতে হবে। সিন্ধু উপত্যকা এবং তার বাইরে যে বিশাল এলাকাজুড়ে এই সভ্যতা বিস্তৃত ছিল, তা কিন্তু সমস্ত এলাকায় একই সঙ্গে বিলুপ্ত হয়নি। হরপ্তা ও মোহেনজোদারোর বিলুপ্তির এক বা দ্বিতীয় বছর পরেও সুরক্ষাটোরা প্রভৃতি অঞ্চলে এই সভ্যতা টিকে ছিল। এর পরেও গুজরাট, রাজস্থান ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ভঙ্গুর অবস্থাতেও এই সভ্যতার অস্তিত্ব বজায় ছিল। এই সভ্যতার সকল কেন্দ্রগুলোর পতনের পশ্চাতে একই কারণ বা প্রেক্ষাপট ছিল না। দু-একটি নগর বা কেন্দ্রের পতনের কারণ এক হলেও সর্বত্র তা সমান ছিল না। আকস্মিকভাবে হঠাৎ এক দিনে এই সভ্যতার পতন হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে ক্রমিক অবক্ষয়ের ফলে সভ্যতাটি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে এবং তার পরেই আসে চরম বিপর্যয়, যা সভ্যতাটির বিলুপ্তি ঘটায়।

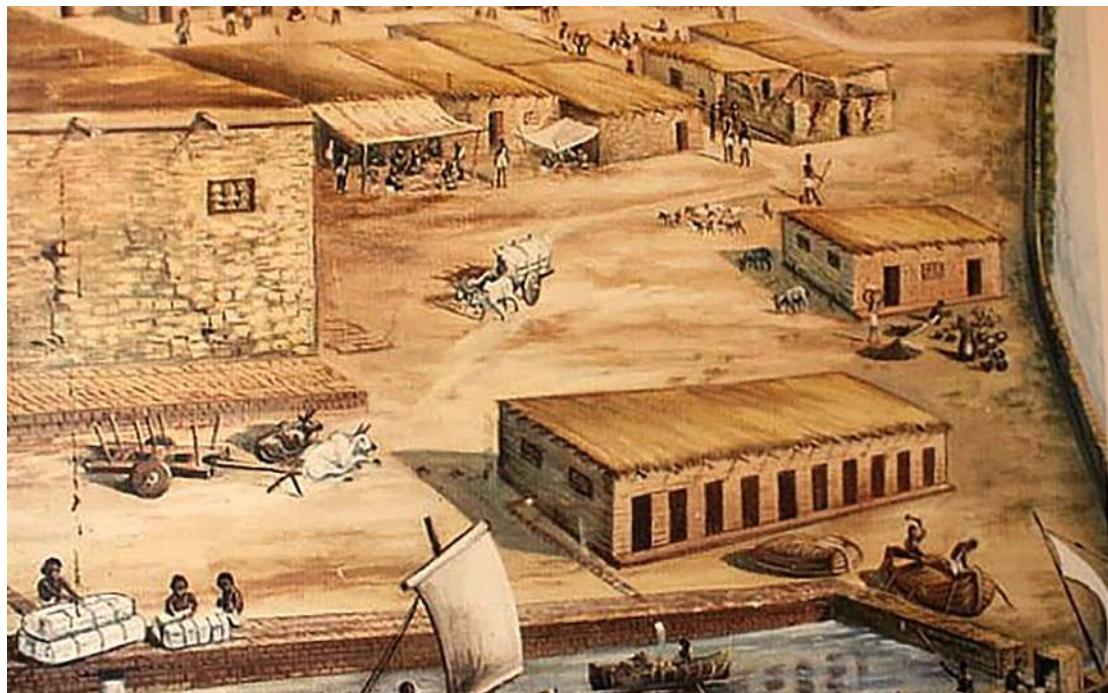
সিঁড়ু ও হরপ্পা সভ্যতার কত অজানা বিষয় সম্পর্কে জানলাম তাই না! চলো তাহলে নিচের ছকে এসব বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি জিনিসের কিছু ছবি এঁকে ফেলি।

বিষয়	ছবি
অলংকার	
খেলনা	
সিল	
মৃৎপাত্র	

হরপ্লা সভ্যতার পতনের সম্ভাব্য কারণগুলোকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ১. প্রাকৃতিক কারণ; ২. অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়; ৩. অন্যান্য কারণ।

১. প্রাকৃতিক কারণ : হরপ্লা সভ্যতার পতনের জন্য অনেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণগুলোকে দায়ী করে থাকেন। এই প্রাকৃতিক কারণগুলো হলো ক. জলবায়ুর পরিবর্তন, খ. মরুভূমির প্রসার, গ. সিক্ক নদের গতিপথ পরিবর্তন, ঘ. ভূমিকম্প, �ঙ. বন্যা, চ. খরা।

২. অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় : অনেকে হরপ্লা সভ্যতার ধর্ম বা পতনের জন্য এই সভ্যতার অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের বিষয়টিকেই দায়ী করেছেন। তাঁদের মতে অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় সামাজিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা, বিভিন্ন নগরের মধ্যের যোগাযোগ ও বিনিময়ের সম্পর্কের অব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়া হরপ্লা সভ্যতার পতনের পথ প্রস্তুত করেছিল। এসবের মধ্যে রয়েছে, হরপ্লা সভ্যতার নিচের স্তরগুলোতে যে উন্নত নাগরিক সভ্যতার ছাপ পাওয়া যায় তার তুলনায় ওপরের স্তরগুলোতে নাগরিক জীবনের অবক্ষয়ের চিত্রটি উল্লেখযোগ্যভাবে চোখে পড়ে। তুলনা করলে দেখা যায় বাড়িগুলি রাস্তা দখল করে নিছে, গলিপথগুলো ক্রমে সরু হয়ে আসছে, নর্দমাগুলি অপরিক্ষার থেকে যাচ্ছে, বড়ো অট্টালিকাগুলি পৃথক করে ছোটো ছোটো খুপরি তৈরি হচ্ছে, কৃষি ও বাণিজ্যের অবনতি ঘটছে এবং প্রযুক্তিতে যেমন মৃৎপাত্র তৈরিতে মানের অবনমন ঘটেছে।



কোনো একটি নগরের বাজার, জলপথ, পরিবহনসহ একটি সাধারণ দৃশ্য ইতিহাসবিদগণ কল্পনা করে ঢাঁকেছেন।

হরপ্লার পরে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন মানুষ, সমাজ ও বসতি :

যমুনা এবং শতদু বা শতলুজ নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় প্রায় ৫৬৩টি হরপ্লা-পরবর্তী জনবসতি চিহ্নিত করা হয়েছে। বেশির ভাগ বসতি ছোট এবং ৫ হেক্টারের নিচে। এর মধ্যে সেমেটারি-এইচ সংস্কৃতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলের পাঞ্জাব অঞ্চলের একটি ব্রোঞ্জ যুগের সংস্কৃতি। এটি ছিল হরপ্লা সভ্যতার শেষ পর্যায়ের একটি আঞ্চলিক রূপ। এছাড়া হিন্দুকুশ পর্বতের পাশে পেশোয়ার ও চিত্রালের মাঝে একটি স্থানে

অনেকগুলো কবরের সন্ধান পাওয়া যায় যা গান্ধার গ্রেট সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে। গাঞ্জোয় অববাহিকায় ব্রোঞ্জ যুগের গৈরিক রঙের মৃৎশিল্পের সংস্কৃতি গড়ে উঠে। দক্ষিণভাগে লোহার প্রচলন হয়। সেখানে বিভিন্ন ধরনের বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরি স্মারক স্থাপনা পাওয়া যায়। ওই স্থাপনাগুলো মেগলিথ নামে পরিচিত। এছাড়া, পশ্চিম ভারতের কিংবা পূর্ব ভারতের বিহার ও পশ্চিম বাংলায় লাল ও কালো রঙের মৃৎপাত্র আর তামার ব্যবহারকারী মানব বসতির প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্য ও উত্তর ভারতেও চিত্রিত ধূসর মৃতপাত্রের এবং লোহার ব্যবহারের সূত্রপাত হয়। হরপ্লা সভ্যতার অবনমনের পরে আবারও নগর সভ্যতা গড়ে উঠতে প্রায় ১৫০০-১৮০০ বছর সময় লাগলেও এই সময়ে বিভিন্ন বসতি পাওয়া গেছে যেগুলো প্রাচীর ঘেরা, বৃহদাকৃতির, এবং কৃষি-বাণিজ্য-লোহার ব্যবহারনির্ভর। লৌহযুগের সূত্রপাত সে হিসেবে ১২০০-১০০০ সাখারণ পূর্বান্দে শুরু হয়। তাই মনে করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই যে, হরপ্লা সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেছিল। উত্তর-পশ্চিমাংশে নগরগুলো পরিত্যক্ত হলেও বসতি অন্যভাবে টিকে ছিল। আর অন্যান্য অংশে মানুষজন প্রযুক্তি, কৃষিকাজ ও জীবনযাপনে পরিবর্তন আনছিল। এ সময় নগর ও রাষ্ট্র বিকশিত না হলেও নানা গোক্র, বংশধারা আর আঞ্চলিক সমষ্টি বিকশিত হচ্ছিল। বিশেষ করে, মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল থেকে দলে দলে মানুষ ভারত উপমহাদেশে আগমন করছিল নতুন জীবন, নতুন ভাষা আর নতুন প্রযুক্তি নিয়ে। তাদের একটা বড় অংশ যায়াবর ও পশুপালক ছিল। হরপ্লা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্থানের মানুষের সঙ্গে এই মধ্য এশীয় মানুষদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল প্রায় এক হাজার বছর ধরে। এই মধ্য এশিয়ার মানুষদেরই আর্য নামে ডাকা হতো। তারা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা আর বংশতত্ত্বিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়েছিল। ঋগ্বেদসহ পরবর্তী সময়ে সংকলিত বেদ ও বেদ পরবর্তী নানা লিখিত উৎসের সৃষ্টি হয়েছিল এই আগমন, সংমিশ্রণ ও বৃপ্তান্তের সময়েই।

বেদ

বেদ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ ‘জ্ঞান’। এটি হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ। ঝক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারটি খন্দের সংকলন বলে বেদের আরেক নাম সংহিতা। বেদে অনেক সামাজিক বিধি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প ইত্যাদির কথা ও আছে। এজন্য বেদকে সমাজ, সাহিত্য রাজনীতি, অর্থনীতির এক ঐতিহাসিক দলিল হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।



সামাজের বিস্তার, নগর-রাষ্ট্র আর বৈচিত্র্য: পরিচয়, ভাষা, জীবনের অবিরাম বদল

ভাষা ও লেখার নতুন ধরন, সমাজের পরিবর্তন

গত অধ্যায়ে তোমরা হরপ্লা সভ্যতা এবং সেই সভ্যতার ধীরে ধীরে অবনমনের পরে ভারত উপমহাদেশে নানা ধরনের তাম্রপ্রস্তরযুগীয় আর নব্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা আর নতুন বিকাশ লক্ষ করেছো। আরও জেনেছো যে, ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন সময়ে টেক্যুর মতন একেকে দল মানুষ তাদের সংস্কৃতি, জীবনযাপন, দৈহিক বৈশিষ্ট্য আর ভাষা নিয়ে এসেছে। হরপ্লা সভ্যতার বিকাশ ঘটায় এমন মিশ্রিত মানুষের দল প্রখান ভূমিকা রেখেছিল। হরপ্লা সভ্যতার অবনমনের পরে সেখানকার মানুষ গঙ্গা-যমুনা অববাহিকার উত্তর-পশ্চিমাংশে, দক্ষিণ ভারতে আর পূর্ব ভারতে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে চলে যেতে থাকে। আনু. সাধারণ ২০০০ থেকে ১৫০০ পূর্বাব্দ এবং তার পরেও আরেক দল মানুষ বর্তমান রাশিয়া-ইউক্রেন-মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত তৃণভূমি অঞ্চল থেকে দলে দলে ভারত উপমহাদেশে আগমন করতে থাকে। তারা নিজেদের আর্য ভাষী বলে পরিচয় দিতেন ইতিহাসবিদগণ মনে করেন, আর্য শব্দটি কোনো জাতিগত, ধর্মীয় বা জীবনযাপনগত শ্রেষ্ঠত যেমন প্রকাশ করে না; তেমনি একটা বিশেষ নরগোষ্ঠীকেও প্রকাশ করে না। তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, হরপ্লা সভ্যতার মানুষ কোন ভাষায় কথা বলতো, কোন লিপিতে লিখতো। সমসাময়িক মিসরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার ভাষা ও লিপি যেভাবে পড়া সম্ভব হয়েছে, হরপ্লার বিভিন্ন নগর-কেন্দ্র ও বসতিগুলোতে বসবাসকারী মানুষদের ভাষা ও লিপি এখনো পড়া সম্ভব হয়নি। তবে অনেক গবেষক আছেন যারা ভাষার ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন ভাবেই গবেষণা করেন। তাদের ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বিক বলা হয়। আবার কখনো কখনো তাদের ভাষাতত্ত্বিক প্রয়ত্নবিদও বলা হয়ে থাকে।

তৃণভূমি থেকে আগত এসব মানুষ মূলত পশুপালক ও যায়াবর সম্পদায়ের ছিল। তারা ঘোড়া পোষ মানিয়েছিল। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করায় তাদের কম সময় লাগতো। তারা কৃষিকাজ যেমন জানতো না, তেমনি স্থায়ীভাবে বসবাস করার মতন নগর তৈরি করাও তারা শিখে উঠতে পারে নি। তাদের ভাষাও ভিন্ন ছিল। সকলের ভাষা এক ছিল না। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ববিদগণ তাদের ভাষা এবং তাদের বিভিন্ন স্থানে অভিবাসনের ফলে নানা স্থানীয় ভাষার সঙ্গে সংমিশ্রণে বিভিন্ন ভাষা তৈরি হয়েছে। এসব ভাষাকে একেব্রে ভাষাতত্ত্বিকগণ একটা শ্রেণিতে রেখেছেন। এদের বলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা শ্রেণি।

অভিবাসন:

অভিবাসন হলো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মানুষের স্থানান্তর। বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী বা মানুষের গ্রাম থেকে শহরে আগমন, স্থান বদল, কয়েক দিন কিংবা বহু বছর নিজের আদি বা স্থায়ী বাড়ি থেকে অনুপস্থিতি।

তৃণভূমি :

ঘাসে আচ্ছাদিত বিশাল এলাকাকে তৃণভূমি বলে। এখানে ঘাসের বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ থাকে কিন্তু লম্বা গাছপালা, বিশেষ করে গাছ এবং গুল্মগুলো জন্য থাকে না।

বৈশিষ্ট্য:

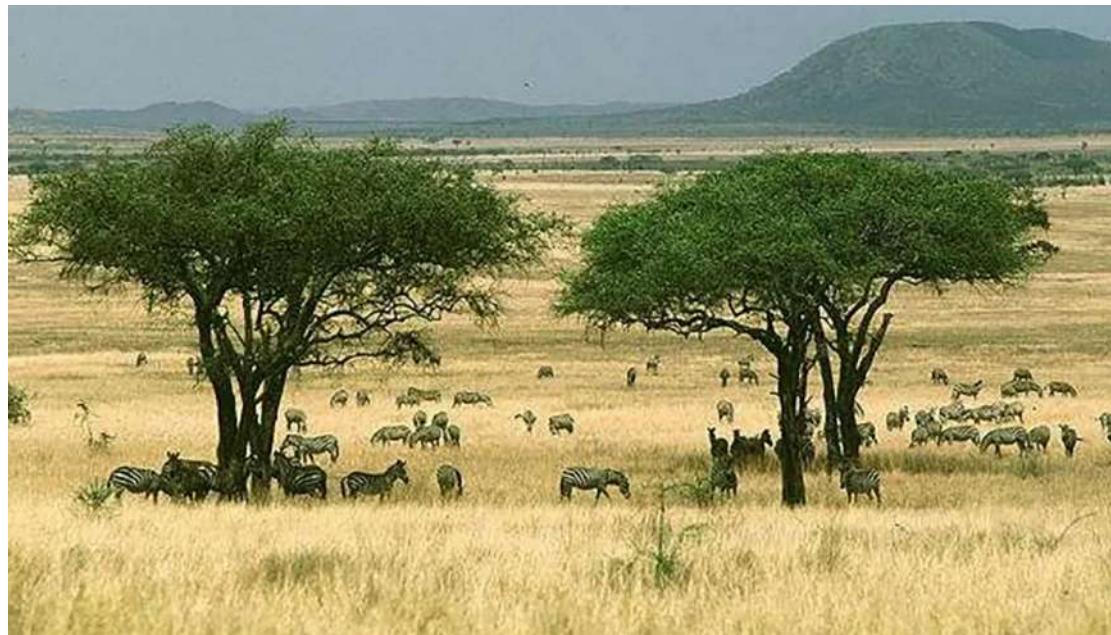
তৃণভূমিতে বিভিন্ন ধরনের ঘাস জন্মে। তৃণভূমিতে কোনো গাছ না-ও থাকতে পারে আর থাকলেও শুধু বিক্ষিপ্ত কিছু। সাধারণত জমি সমতল হয়।

তৃণভূমি গবাদি পশু চরানোর জন্য উত্তম। তৃণভূমিতে চাষের জন্য ভালো মাটিও রয়েছে।

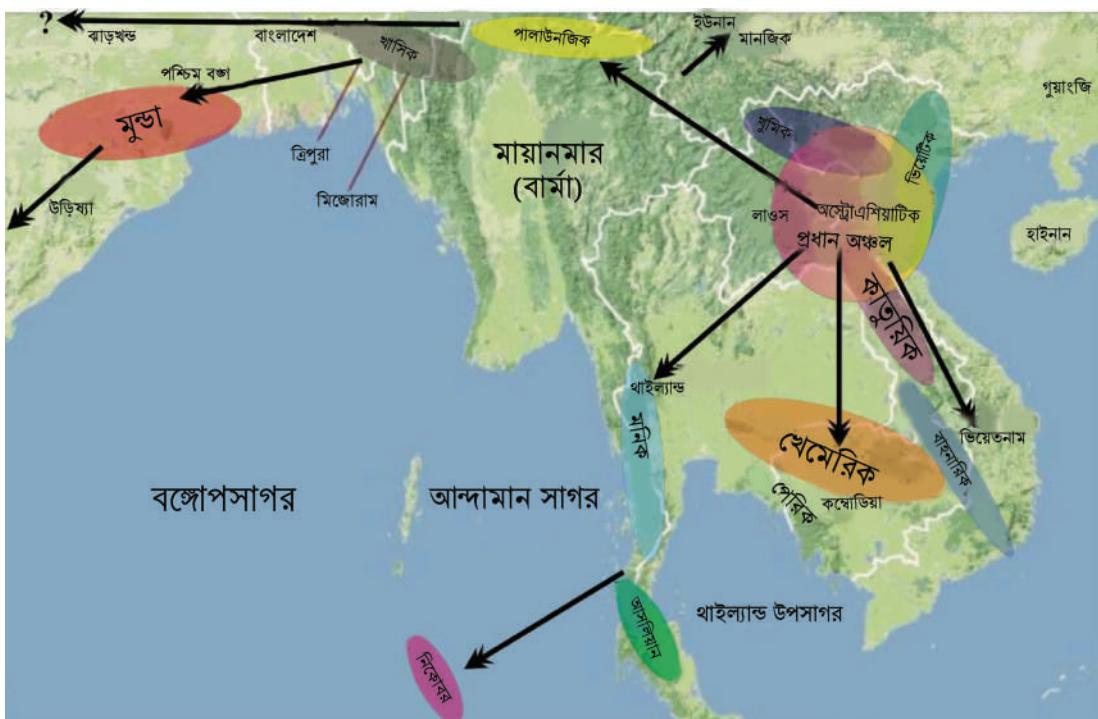
তৃণভূমির প্রকারভেদ:

গ্রীষ্মমন্দলীয় তৃণভূমিকে সাভানা বলা হয়। আফ্রিকা, ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বাজিল এবং অস্ট্রেলিয়ায় গ্রীষ্মমন্দলীয় তৃণভূমির এলাকা রয়েছে। সাভানার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। তাপমাত্রা উচ্চ এবং জলবায়ু আর্দ্র ও শুক্র। শুক্র মৌসুমে সাভানায় অল্প বৃষ্টিপাত হয়।

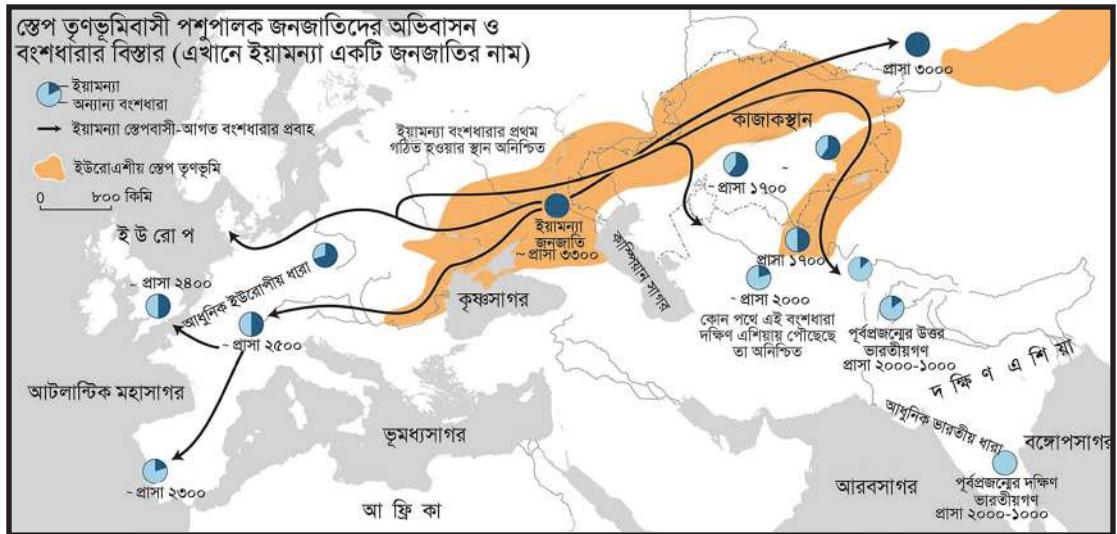
নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির জলবায়ু কম চরমভাবাপন্ন। উত্তর আমেরিকার প্রেইরিগুলো নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি। আর্জেন্টিনার পাম্পাস, দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড এবং মধ্য এশিয়ার স্টেপসও তাই। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বিশাল রেঞ্জল্যান্ডগুলোও নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি।



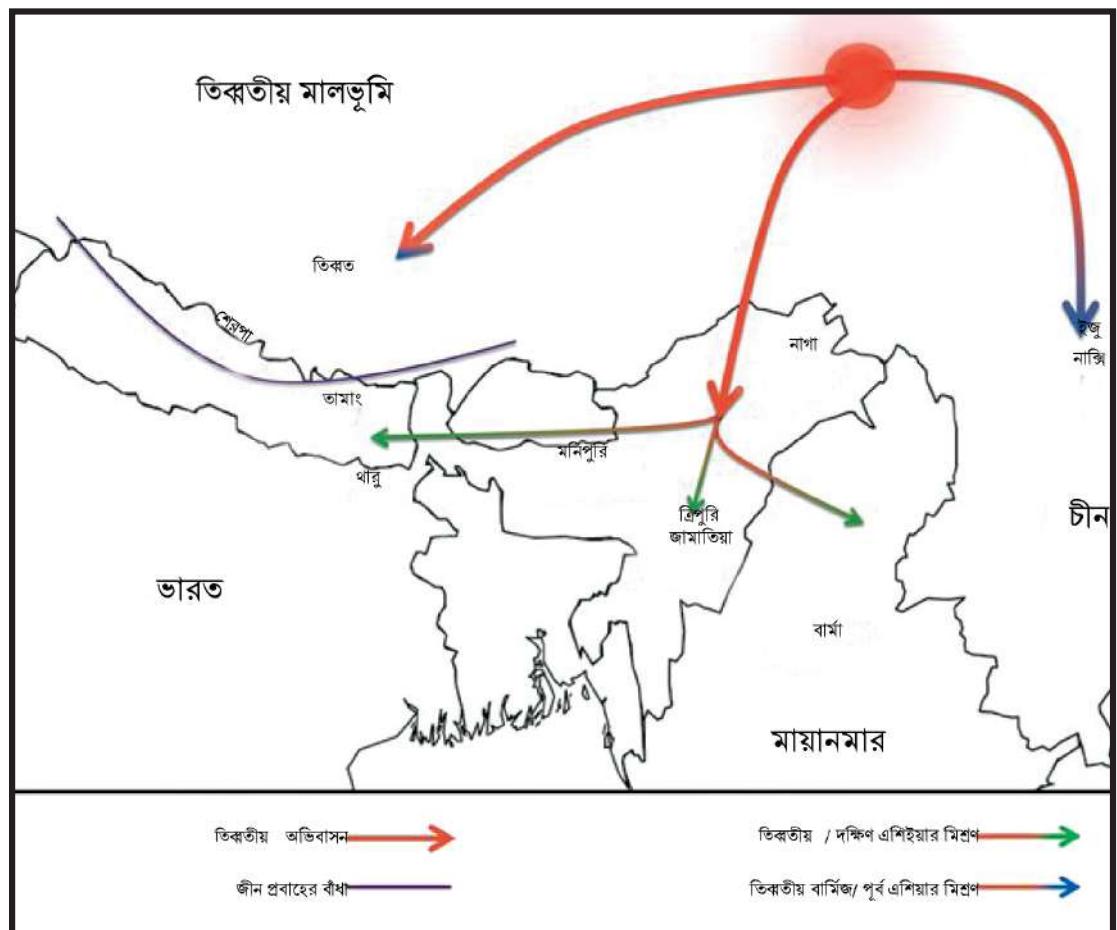
অন্যদিকে, হরপ্লা সভ্যতার অবনমনের পরে যে জনগোষ্ঠীগুলো দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে মধ্য ভারতের বিক্ষ্য পর্বতমালার দক্ষিণে) চলে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের সংমিশ্রণে তৈরি হলো যে ভাষা শ্রেণি, তার নাম দেওয়া হয়েছে দ্রাবিড়ীয় ভাষা। ভাষাতাত্ত্বিক, প্রয়ুত্ত্ববিদ এবং বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, হরপ্লা সভ্যতার মানুষেরা মূলত এই দ্রাবিড়ীয় ভাষার কাছাকাছি কোনো একটি ভাষায় কথা বলতো। তৃণভূমি থেকে আসা পশুপালকরা ভারত উপমহাদেশে আসার পরে অনিবার্যভাবেই স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে তাদের মিশ্রণ ঘটে। সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে, তৃণভূমি থেকে আসা এই দলগুলো মূলত পুরুষপ্রধান ছিল। ভারত উপমহাদেশে আসার পরে তারা স্থানীয় দ্রাবিড়ীয় ভাষী নারীদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। ফলে তাদের বংশধররা ধীরে ধীরে তাদের ভাষা আর আগত তৃণভূমির জনগোষ্ঠীর ভাষার মিশ্রণে কথা বলতে শুরু করেছে। আগত জনগোষ্ঠীগুলো যে ভাষায় প্রথম দিকে কথা বলতো তা ছিল সংস্কৃত ভাষার একটি আদি রূপ। তাদের মধ্যে শুত ও স্মৃতিতে সঞ্চালিত বিভিন্ন ধর্মাচরণমূলক বিধিবিধান পরে লিপিবদ্ধ হতে শুরু করে। এই লিপিবদ্ধ রূপই হলো ঋগ্বেদের বেশি কয়েকটি অংশ। বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন বিধিবিধান ও সূত্র যুক্ত হতে হতে পরে ঋগ্বেদ সংহিতা পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। বেদের অন্যান্য বিভিন্ন সংহিতা (যেমন: সাম, যজুর এবং অথর্ব বেদ সংহিতা গুলো আর প্রতিটা সংহিতাগুলোর সঙ্গে যুক্ত ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এবং আরণ্যকগুলো) আদি সংস্করণের পরে বিভিন্ন সময়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ দেখিয়েছেন যে, আদি সংস্কৃত থেকে পরবর্তী সময়ে সংহিতা ও অন্য গ্রন্থগুলোর সংস্কৃত ভাষায় যে ফারাক তাতে দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলোর সঙ্গে মিশ্রণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন একটা প্রমাণের কথা বললে তোমরা বুঝতে পারবে। আদি সংস্কৃততে বা অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা (যেমন: প্রাকৃত) মুর্ধণ-খনিটি ছিল না (আমাদের বাঞ্জন বর্ণেট, ঠ, দ, ধ, ণ, ড় আর চ মুর্ধণ খনি, কারণ এগুলো উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার আগা উল্টিয়ে মাড়ির গোড়ায় বা মুর্ধায় শক্তভাবে ছুঁতে হয়।)। তবে এই খনিগুলোর অস্তিত্ব ছিল দ্রাবিড়ীয় ভাষায়। তাই সংস্কৃততে মুর্ধণ খনির ব্যবহার শুরু হয়েছে বেশ পরে। এ ছাড়াও ঋগ্বেদে দ্রাবিড়ীয় ভাষার অনেকগুলো শব্দ পাওয়া গেছে। ওই শব্দগুলোও ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোর মিশ্রণের প্রমাণ বহন করে।



দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক জনগোষ্ঠীগুলোর অভিবাসনের পথ।



তেপ তৃণভূমি থেকে জনগোষ্ঠীর (ইয়ামন্য নামের) বিভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গমন।



তিবেতোবার্মিজ ভাষাগোষ্ঠীগুলোর উত্তরপূর্ব দিকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পশ্চিম দিকের ভারত উপমহাদেশে
ও বাংলা অঞ্চলে অভিবাসনের ধারা।

মানচিত্রে অক্ষ ও দ্রাঘিমারেখা

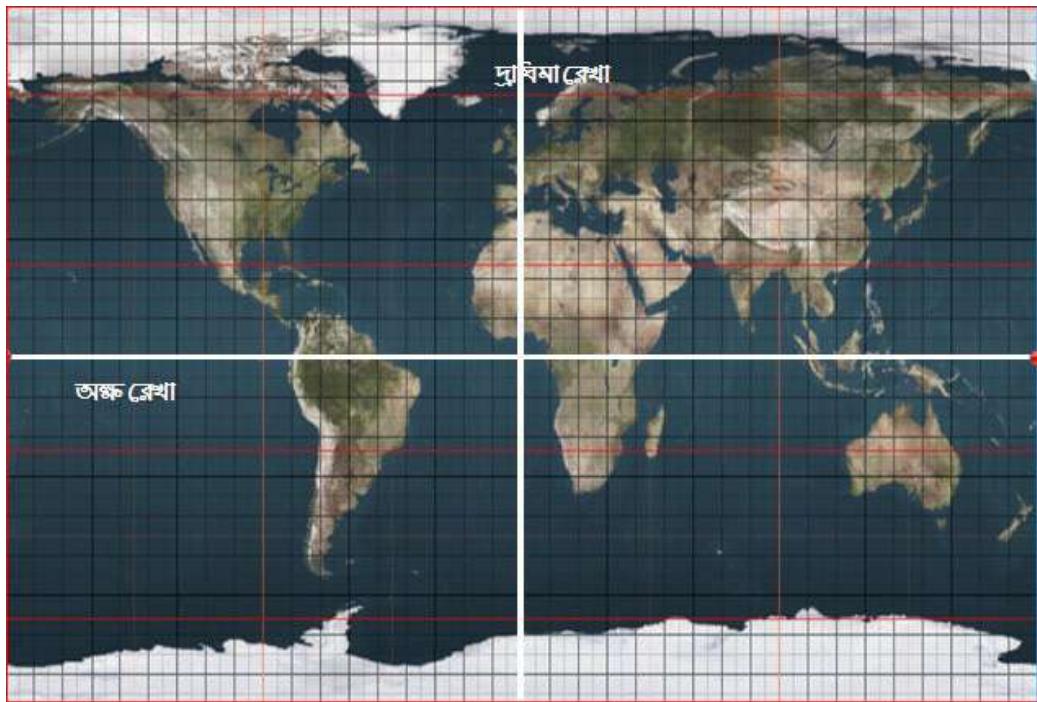
তোমরা তো দেখলে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নানা প্রয়োজনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অভিবাসন করেছে, গড়ে তুলেছে বিভিন্ন জনপদ, করেছে বিভিন্ন দিকে বাণিজ্য যাত্রা। এসকল কাজে তাদের প্রয়োজন হতো পথ চেনার জন্য দিক নির্ণয় করা। আদি কাল থেকে মানুষ বিভিন্ন ভাবে পথ চিনে নেওয়ার কাজ করতো। কখনও খুব তারা বা অন্য কোন তারার সাহায্যে; তারপর এলো কম্পাসের ব্যবহার। বর্তমানে তো আমরা গুগুল ম্যাপ বা জিপিএস ব্যবহার করে আমাদের পথ সহজেই চিনে নিতে পারি। কিন্তু জানো কি এই গুগুল ম্যাপ বা জিপিএস কিভাবে কাজ করে? এটা জানতে আমাদের প্রথমে খুব ভালো পৃথিবীর মানচিত্র বা গ্লোব সম্পর্কে বুঝতে হবে।

আমাদের পৃথিবী সৌরজগতের এক বিস্ময়কর গ্রহ। প্রাণ ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান কেবল এই গ্রহে সঠিক মাত্রায় রয়েছে। আচ্ছা, যদি বলি আমাদের এই পৃথিবীর আকার কেমন? আমরা চারদিকে তাকালে কি এর আকার বুঝতে পারি? মনে হয় এটি যেন একটি গোলাকার চাকতি বা থালার মতো, তাই না? আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীকে একটি থালার মতো মনে হয়। মনে হয় ঘরবাড়ি নিয়ে আমরা ঐ থালা বা চাকতির উপরে আছি। কিন্তু পৃথিবী থালা বা চাকতির মতো নয়। এটি বৃত্তাকার কিন্তু চ্যাপ্টা নয়, গোলাকার তবে পুরোপুরি গোলাকারও নয়। পৃথিবী উত্তর দক্ষিণ দিকে কিছুটা চাপা।

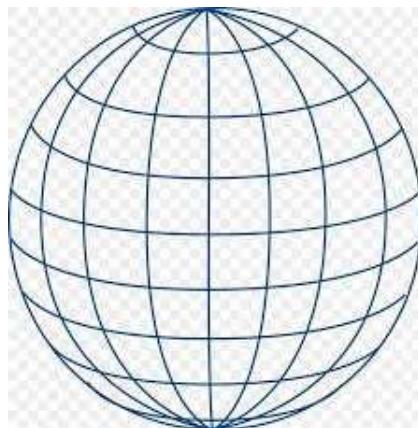
যদি বলি পৃথিবীর মানচিত্র তাহলে নিশ্চয় তোমাদের গ্লোবের কথাই মনে আসবে তাই না?



তোমরা নিশ্চয় গ্লোবে দেখেছ উপর-নিচ এবং পাশাপাশি অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম বরাবর কিছু কল্পিত রেখা আছে। তাদের আবার নামও আছে। পুরো ভূগোলক জুড়ে উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর রেখাগুলোকে বলে দ্রাঘিমা রেখা আর পূর্ব পশ্চিম বরাবর সমান্তরাল রেখাগুলোকে বলে অক্ষ রেখা।



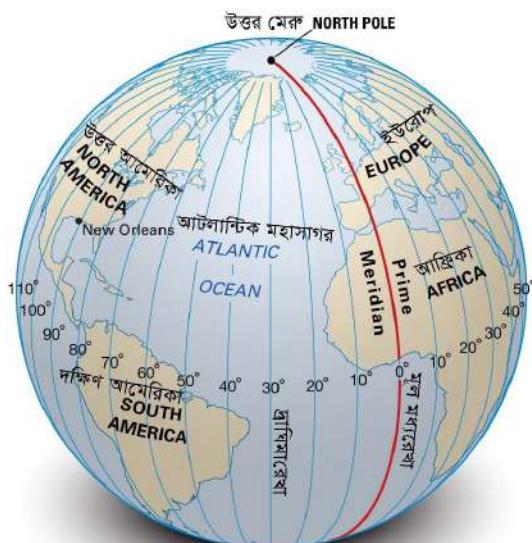
এই অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলো পরস্পরকে ছেদ করে অনেকগুলো প্রায় চারকোনা খোপ তৈরি করেছে, তাই না? এইগুলো মূলত এক একটি গ্রিড যেগুলো তোমরা গ্রাফ কাগজে দেখেছ। গ্রাফ পেপারে যেমন তুমি এই গ্রিডের সাহায্যে নিখুঁত পরিমাপ করতে পারছ তেমনি এই রেখাগুলো দ্বারা তৈরি গ্রিডের সাহায্যে পৃথিবীর নিখুঁত মানচিত্র আঁকা সম্ভব হয়েছে।



তোমরা জ্যামিতিতে কোণ পরিমাপের একক হিসেবে যে ডিগ্রী ব্যবহার কর, এই রেখাগুলোকে সেই ডিগ্রী দিয়েই চিহ্নিত করা হয়। বিশুবরেখাকে 00 ডিগ্রী ধরে উত্তর দক্ষিণে 900 করে মোট 1800 এবং মূল মধ্য রেখাকে 00 ডিগ্রী ধরে পূর্ব পশ্চিমে 1800 করে মোট 360 ডিগ্রী পর্যন্ত ধরা হয়। এর মধ্যে কয়েকটির আবার আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। চলো আমরা নিচের ছবি ও গ্লোবের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অক্ষ ও দ্রাঘিমা রেখার নাম খুঁজে বের করি এবং সেগুলো একটি ছক আকারে লিখে ফেলি।



অক্ষরেখা



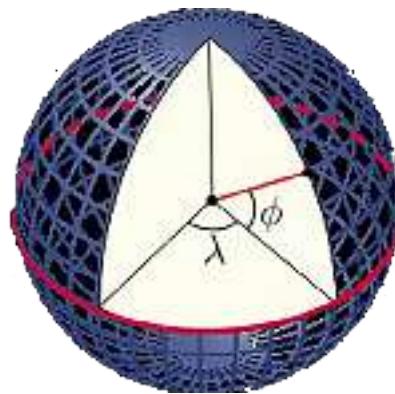
ଦ୍ୱାଧିମାରେଖା

অক্ষরেখা	দ্রাঘিমারেখা

এবার দেখি এই অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা থেকে কিভাবে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ বের করা যায়। তার আগে কোণ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। একটি বিন্দু থেকে দুটি রশ্মি যে অবস্থান তৈরি করে তাকে কোণ বলা হয়, যাকে সাধারণত ডিগ্রী একক দ্বারা পরিমাপ করা হয়। ডিগ্রীর এই পরিমাণ দিয়ে কিন্তু রশ্মি দুটি কত বড় কিংবা একটি রশ্মি আর একটি রশ্মির চেয়ে কত দূরে তা বোঝানো হয় না। একটি রশ্মিকে স্থির ধরে রশ্মিটির যেকোনো একটি বিন্দু অন্য রশ্মিটির প্রারম্ভিক বিন্দু স্থির রেখে সম দূরত্বের বিন্দুটি কতটুকু সরেছে (বা ঘুরেছে), তা বোঝানো হয়।

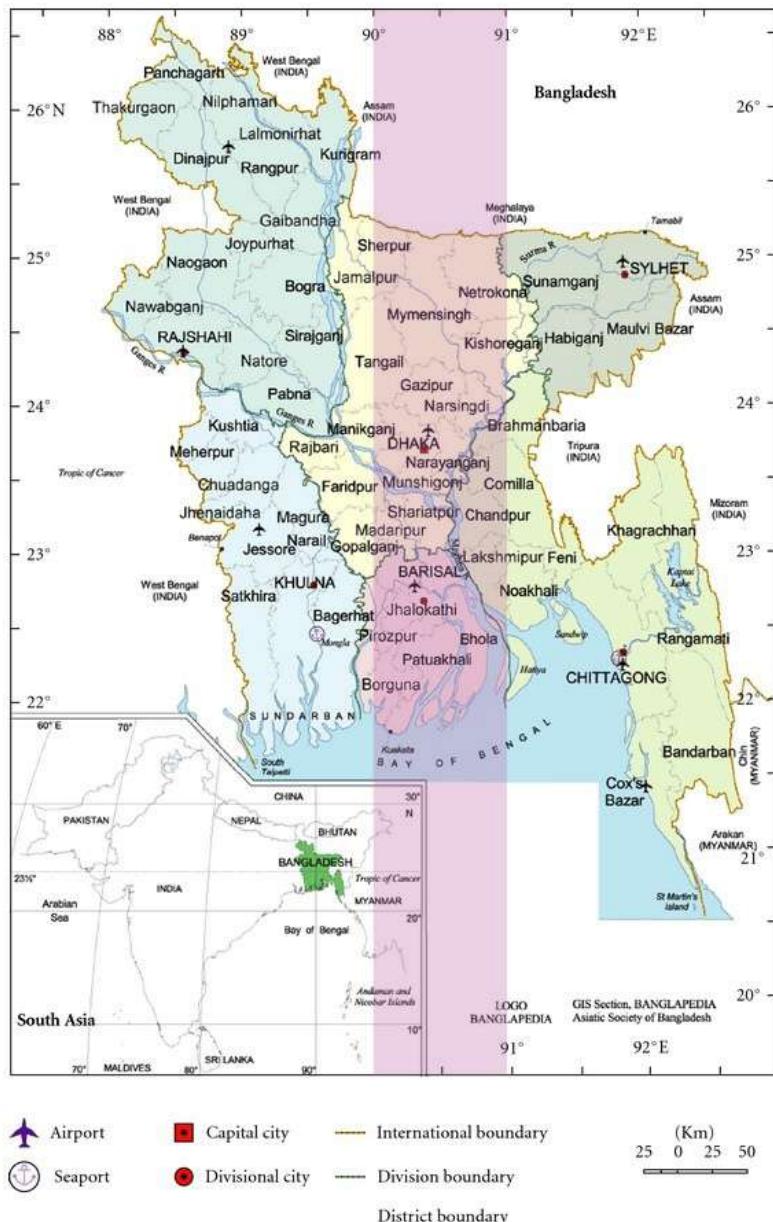
চিত্রে দেখ শীর্ষবিন্দুর (যে বিন্দুতে কোণ তৈরি হলো) কাছে হলে 300 বেশ খাট আবার দূরে হলে বেশ লম্বা/বড়। (এখানে একটা 300 কোণের ছবি হবে)

নিরক্ষরেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সে স্থানের অক্ষাংশ (Latitude) বলে। মূলমধ্য রেখা হতে উত্তর বা দক্ষিণে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সে স্থানের দ্রাঘিমাংশ (Longitude) বলে। তোমরা কিন্তু দূরত্ব বলাতেই এটাকে কিলোমিটারের মত ভেবে নিও না। কিলোমিটার হলো রৈখিক দূরত্বের (Linier distance) একক আর ডিগ্রী হলো কৌণিক দূরত্বের (Angular distance) একক।



অক্ষাংশ (ϕ) এবং দ্রাঘিমাংশ (λ)

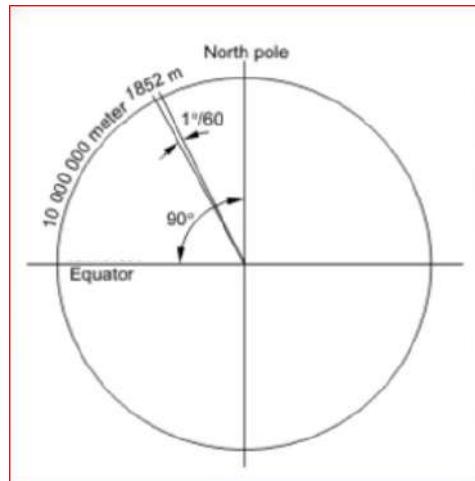
তোমরা চাইলে ভূগৃহের এই কৌণিক দূরত্বকে রেখিক দূরত্বে হিসাব করতে পার। তোমরা জান একটি সম্পূর্ণ ঘূর্ণনের পরিমাণ হলো ৩৬০০। পৃথিবীর পরিধি (একবার ঘুরে এলে) বিশুব রেখা বরাবর ৮০,০৭৫ মিলোকিটারের মত, একে ৩৬০ দিয়ে ভাগ দিলে ১১১ এর চেয়ে একটু বেশি হয়। অর্থাৎ ১ ডিগ্রী অক্ষাংশ কৌণিক দূরত্ব সমান ১১১ কিলোমিটারের একটু বেশি। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ কে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ড একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একটি ডিগ্রি ৬০ মিনিটে বিভক্ত। এক মিনিটকে আবার ৬০ সেকেন্ডে ভাগ করা যায়।



এই মানচিত্রের চিহ্নিত অংশটি ১০। একে ৬০ মিনিটে ভাগ করে দেখাতে হবে। আবার ৬০ মিনিটের ১ মিনিট কে ৬০ সেকেন্ডে ভাগ করে দেখাতে হবে।

তোমরা নিশ্চয় সাগর মহাসাগরের দূরত্ব মাপতে মাইলের আগে নটিক্যাল শব্দটির ব্যবহার দেখেছো তাই না! এই নটিক্যাল মাইল কিভাবে এলো জানো? নটিক্যাল মাইল ভূমিতে এক মাইলের চেয়ে সামান্য লম্বা। এই নটিক্যাল মাইল কিন্তু পৃথিবীর দ্রাঘিমাংশ এবং অক্ষাংশ স্থানাঞ্জের উপর ভিত্তি করে নির্গত করা হয়। এক নটিক্যাল মাইল অক্ষাংশের এক মিনিটের সমান। আমরা যদি একটু হিসাব হরে দেখি তাহলে-

পৃথিবীর গড় পরিধি প্রায় $40,082$ কিলোমিটার কে 21600 [360 (ডিগ্রী) $\times 60$ (মিনিট)] দিয়ে ভাগ করলে 1 নটিক্যাল মাইল হয়। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের বৃত্তচাপের 1 মিনিট অক্ষাংশের দৈর্ঘ্য 1 নটিক্যাল মাইল। উল্লেখ্য, নটিক্যাল কিলোমিটার বলে কিছু নেই। 1 নটিকাল মাইল = 1.15 মাইল (প্রায়) = 1.852 কিলোমিটার (প্রায়)



নটিক্যাল মাইল

অনেক কিছু জানা হলো, চলো এখন আমরা একটা মজার খেলা খেলি। আমরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যাবো। একদল থেকে একজন একজন করে গ্লোব দেখে একটি করে স্থানের নাম বলবে অন্যদল থেকে একজন একজন করে এসে বোর্ডে সেই স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ বের করে লিখবে। একবার একদল স্থানের নাম বলবে এবং একবার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ বের করবে। পর্যায়ক্রমে সবাই একটি করে স্থানের নাম বলবে এবং অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ বের করবে।



বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের সানাউলি নামের স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পাওয়া দুই চাকার রথ ও অস্ত্র। সময়কাল অনুসারে এই আবিষ্কার প্রাক-সাধারণ ১৯০০-১৮০০ অব্দের। স্টেপ তৃণভূমি থেকে দলবদ্ধভাবে অভিবাসনের ধারণার সঙ্গে এই আবিষ্কারের সময়কাল মিলে যায়।

এই গ্রন্থগুলো থেকে ওই সময়ে মানুষের ইতিহাস সম্পর্কেও বিভিন্ন বিষয় জানা যায়। যেমন একটা সময়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বা গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়। একদিকে ছিল ভরত গোত্রের সদস্যরা আর অন্যদিকে দশটি গোত্রের সদস্যগণ। এই যুদ্ধের পরে ভরত গোত্রের আধিপত্য তৈরি হয় উত্তর-পশ্চিম ভারত উপমহাদেশে। ফলে যারা নিজেদের আর্য দাবি করেছেন বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও নানা বিষয় নিয়ে যুদ্ধ ও সংঘাত যে হয়েছিল তারও বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধ এবং বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী গোষ্ঠীর গঙ্গা-যমুনা অববাহিকার বাইরে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে পরে বিভিন্ন মহাজনপদ বা গোত্রভিত্তিক অঞ্চল তৈরি হয়।

মালভূমি:

মালভূমি সমুদ্র সমতল থেকে ৩০০ মিটার বা আরও কিছুটা উর্ধ্বে অবস্থিত খাড়া ঢালযুক্ত সুবিস্তৃত তরঙ্গায়িত বা সামান্য বন্ধুর ভূভাগ মালভূমি নামে পরিচিত। আকৃতিগতভাবে মালভূমি অনেকটা টেবিলের মতো দেখতে হওয়ায় একে টেবিল ল্যান্ড বলে। যেমন ভারতের দাক্ষিণাত্য ও ছোট নাগপুর মালভূমি, তিব্বতের পামির মালভূমি ইত্যাদি।

আঘেয়গিরির ম্যাগমা উপরে উঠে, লাভার নিষ্কাশন এবং জল ও হিমবাহ দ্বারা ভূমি ক্ষয়সহ বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মালভূমি গঠিত হতে পারে।



তারা আরও ভাষাগোষ্ঠীর সংম্পর্শে এসেছে। এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে একটি হলো অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠী। মূলত চীনে কৃষিকাজ, বিশেষ করে ধানচাষ আবিস্কৃত হওয়ার পরে চীন থেকে স্থলপথে একটি গোষ্ঠী ভারত উপমহাদেশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিবাসিত হয়। এই গোষ্ঠীই অস্ট্রো-এশিয়াটিক বিভিন্ন ভাষার বিকাশ ঘটায় (যেমন: মুন্ডা ভাষা, খাসিদের ভাষা)। অন্যদিকে, তিরুত-বার্মা ধারার আরেকটি ভাষাগোষ্ঠীও ভারত উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে আগমন করেন মোটামুটি একই সময়ে। সেই ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোও পরে বিভিন্ন ভাষার বিকাশ ঘটিয়েছে অন্য ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে মিশ্রণের মাধ্যমে। এ ছাড়াও আছে কিছু ভাষাগোষ্ঠী যেগুলোর মধ্যে পরিবর্তন তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।

তাহলে তোমরা স্পষ্টই জানতে পারলে যে, কোনো ভাষাই বিশুদ্ধ, অপরিবর্তনীয় এবং মৌলিক নয়। বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণ থেকে যেমন বিভিন্ন নতুন ভাষার জন্ম হয়েছে। তেমনই বিদ্যমান ভাষায় পরিবর্তন এসেছে। আরও পরে ইতিহাসের হাজার হাজার বছরে আরও নানা ধরনের ভাষাভাষী মানুষ ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসেছে। একদল মানুষের সঙ্গে আরেক দল মানুষের জাতিসম্পর্ক তৈরি হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগ হয়েছে, নতুন ধারণা, চিন্তা, চর্চা তৈরি হয়েছে। আজ আমরা যে প্রমিত বাংলায় কথা বলি, সেই বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর একটি হলেও তাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষার, ধ্বনির, ভাব প্রকাশের চিহ্নের মিশ্রণ ও সমাবেশ ঘটেছে। তোমরা যদি তোমাদের চারপাশের মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, তাহলে দেখবে আমরা এখনো বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণে ও ধ্বনি ব্যবহার করি, শব্দ ব্যবহার করি। তাই ভাষার ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য একদিক থেকে আমাদের ইতিহাসে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী ও ভাষার যোগাযোগ, মিশ্রণ আর মিলনের খুব বড় প্রমাণ। সমাজ ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এই ভাষার পরিবর্তনও তাই যুক্ত। আমরা আরও কিছু এমন পরিবর্তন ও ধারাবাহিকভাবে টিকে থাকা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে আলাপ করবো।

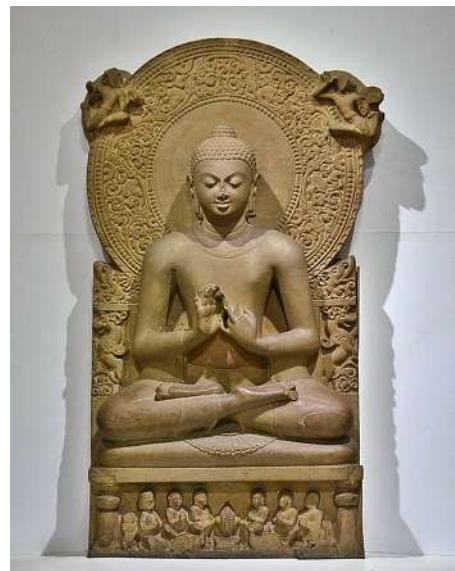
আমরা তো জানলাম কোনো ভাষায় মৌলিক বা অপরিবর্তনীয় নয়। এখন একটা মজার কাজ করি চলো। তুমি যে কোনো একটা বাক্য তোমার পরিবারের সকল সদস্যকে বলে দাও যা তারা নিজ নিজ জন্মস্থানের আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চারণ করে তোমাকে শোনাবে। এবার তুমি সেটা নিচের ছকে লিখে ফেলো।

পরিবারের সদস্য	উচ্চারিত বাক্য	আগত স্থান

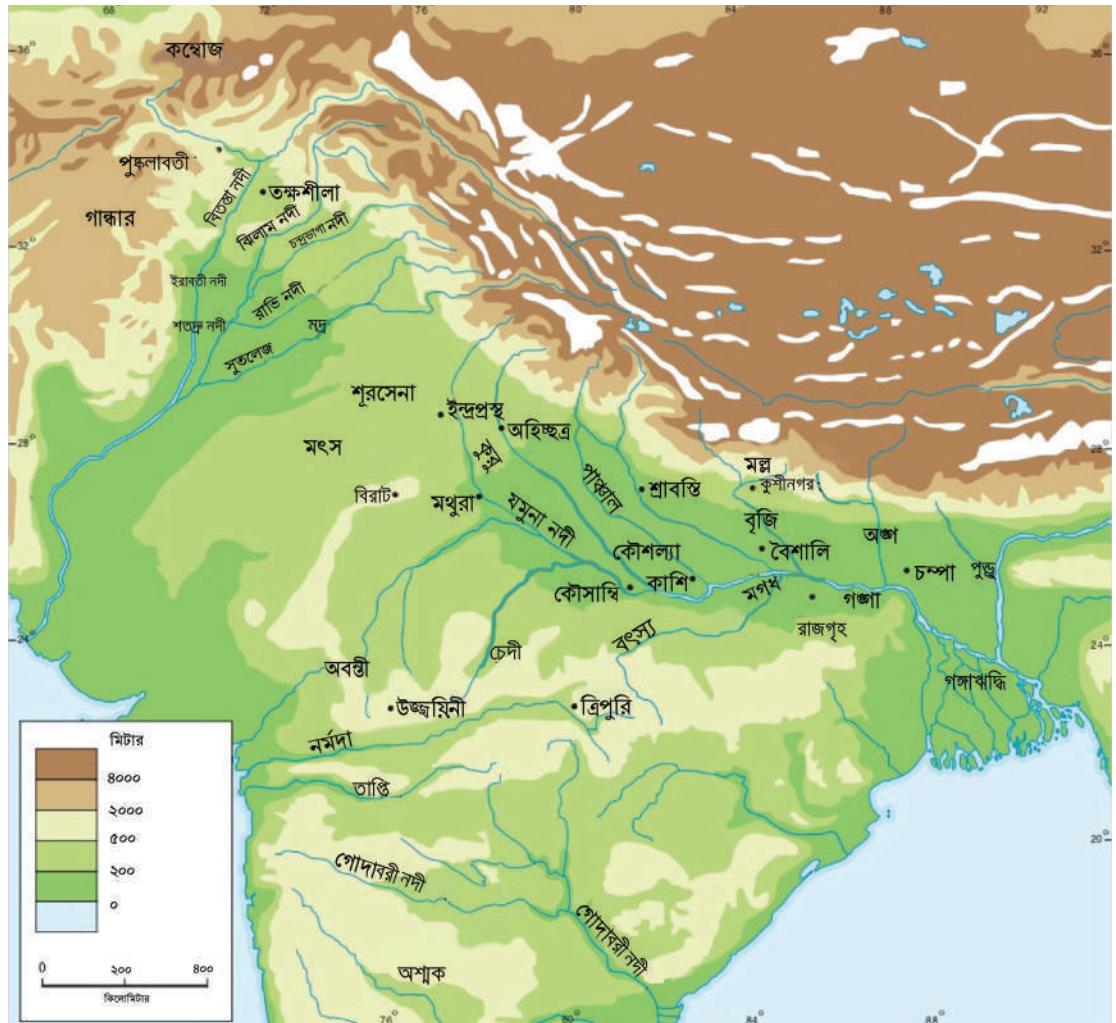
লোহ যুগ, দ্বিতীয় নগর সভ্যতা আর পরিবেশ: সাম্রাজ্য বিষ্ঠার ও ভাঙনের বৈচিত্র্য

আনুমানিক ষষ্ঠি-চতুর্থ সাধারণ পূর্বাব্দের শতকে ভারত উপমহাদেশে একসঙ্গে কর্তকগুলো বড় বদল চূড়ান্ত রূপ পায়। লোহার ব্যবহারের কারণে লাঙলের ফলায় পরিবর্তন আসে। কৃষিকাজের নানা ক্ষেত্রে লোহার তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহারের কারণে অনেক বেশি জমি চাষাবাদ করা সম্ভব হয়। আগে যেসব জমিতে তামা বা ঝোঁঝ বা কাঠের লাঙল দিয়ে চাষাবাদ করা সম্ভব হতো না, সেসব জমিও চাষাবাদের আওতায় আসে। একই সঙ্গে চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে বিভিন্নমুখী তর্ক-বিতর্ক তৈরি হয়। গোতম বুদ্ধ এবং মহাবীর এ সময়ই ভারত উপমহাদেশের পূর্ব দিকের মগধ ও সংলগ্ন অঞ্চলে নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। এই ধর্মমত বৈদিক ধর্মের নানা চিন্তাকে প্রশ্ন করা শুরু করে। পাশাপাশি আরও নানা চিন্তা ও জ্ঞান চর্চা শুরু হয়। এর মানে কিন্তু এই নায় যে, এই সময়ের আগে চিন্তা-তর্ক-বিতর্ক ছিল না। তবে এই সময় থেকেই এসব চিন্তা সূত্র এক-দুই শতক পরের লিখিত উৎসগুলো থেকে পাওয়া যায়।

বৈদিক চিন্তা আগে মুখে মুখে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের মানুষ শিখত। পরে এই সময়ের ঠিক আগেই বৈদিক চিন্তা এবং তার নানারকমের ভাষ্য লিপিবদ্ধ হওয়া শুরু করে। সংস্কৃত, পালি, পাকৃত, তামিলসহ আরও নানান ভাষায় এসব চিন্তা ও সাহিত্য লিপিবদ্ধ হয়েছিল। মুশকিল হলো, অনেক উৎসেরই লিখিত হওয়ার তারিখ বা সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, মুখ থেকে মুখে শুনে মনে রেখে আবার পরের প্রজন্মকে বলে এসব প্রথমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সঞ্চালিত হয়েছে। এভাবে যখন শত শত বছর ধরে মানুষের স্মৃতিতে বিভিন্ন কথা থাকে আর সেই কথা ও ভাষ্য শুন্তি (শোনা বা শ্রবণ করা) আর কথনের (বলা) মাধ্যমে একটি সমাজ মনে রাখে, তখন সেই কথা ও ভাষ্য বিভিন্ন বদল ও রূপান্তর ঘটে। যখন সেই কথা লিখিত রূপ পায়, তখন একটা নির্দিষ্ট ভাষ্য তৈরি হয়। আবার শত বছর ধরে এই লিখিত রূপ আর স্মৃতি ও শুন্তিনির্ভর কথনের কাজ চলতে থাকে লিখিত রূপটির পাশাপাশি। অন্য আরেকজন যখন আবার লেখেন, পরের কোনো সময়ে তার কাহিনি, ভাষ্য, ধরন পাল্টে যায়। ফলে একই টেক্সট বা লিখিত রূপের নানা সময়ে, নানা স্থান ভিন্ন ভিন্ন রূপ তৈরি হয়েছে। কোন রূপটি আগের আর কোন রূপটি পরের তা খুঁজে বের করা সহজ কাজ না। মাঝে মাঝে অসম্ভবও বটে। তাই এই সময়ের অনেক লিখিত উৎসের সময়কাল আর কাহিনির ঘটনা আসলেও অতীতে ঘটেছিল কি না, বোঝা মুশকিল। ইতিহাসবিদগণের একটা বড় দায়িত্ব পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করে করে বিভিন্ন সময়ের সঠিক আর নির্ভরযোগ্য বিবরণ চিহ্নিত করা। লিখিত উৎস বা উপাদান থাকার সুবিধা যেমন আছে, তেমনই অসুবিধাও আছে। সতর্ক না-থাকলে কাল্পনিক অনেক ঘটনাকেও বাস্তব বলে ভুল হতে পারে।



পাথরে খোদিত গোতম বুদ্ধের ভাস্কর্য

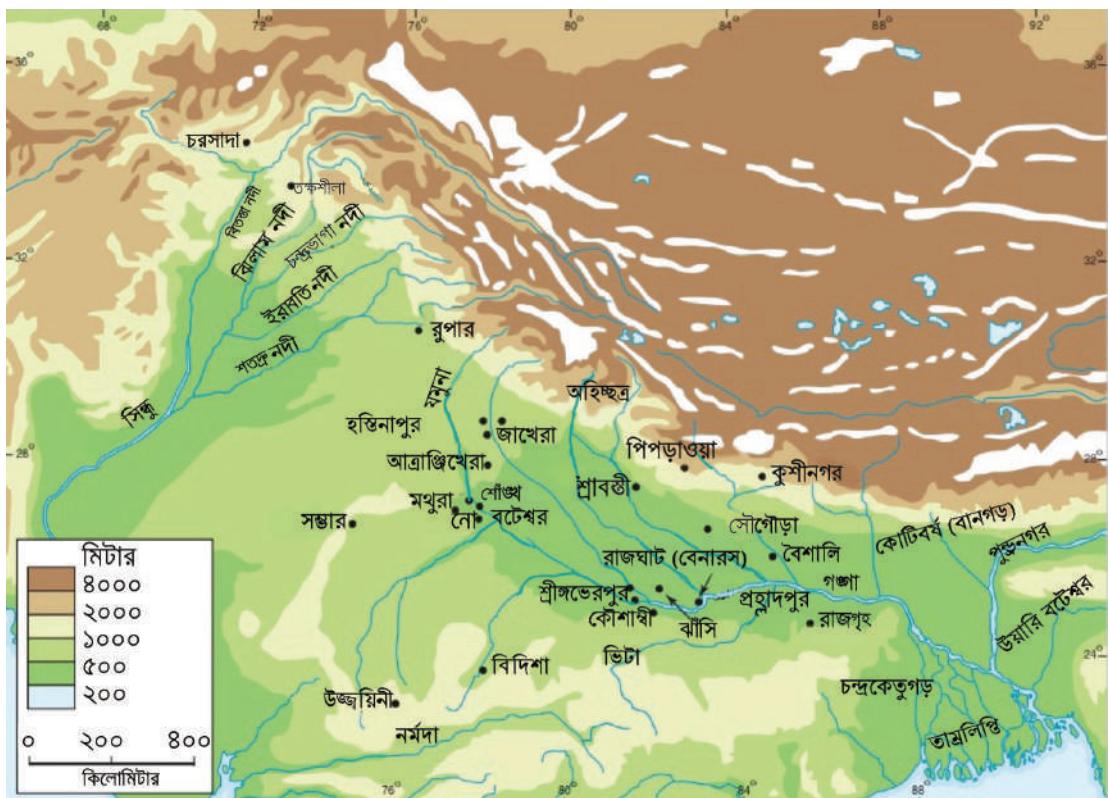


যোলোটি মহাজনপদ ভারত উপমহাদেশের কোন কোন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল তা এই মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। [উৎস : উগ্নিদর সিংয়ের বইয়ের মানচিত্র থেকে রূপান্তরিত]

কৃষিকাজের বিকাশ, সমুদ্রপথে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে বাণিজ্যের বিকাশ, নতুন নতুন চিন্তাভাবনার পাশাপাশি সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হয় সপ্তম-ষষ্ঠ সাধারণ পূর্বাব্দ থেকে শুরু করে। ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রের একটা প্রাথমিক রূপ তৈরি হয়। আলাদা আলাদা গোত্র ও বংশধারাকেন্দ্রিক অঞ্চলের বিকাশ ঘটে। এই সময়ে ভারত উপমহাদেশে যোলোটি এমন অঞ্চল ছিল। এগুলোকে যোড়শ মহাজনপদ বলা হয়। জনপদ ও মহাজনপদের মধ্যে পার্থক্য তোমাদের জানতে হবে। ‘জন’ মানে জনতা বা মানুষজন আর পদ মানে যে-অঞ্চলে ওই মানুষেরা বিচরণ করেন, বসবাস করেন, অধিকার করেন সেই এলাকা বা অঞ্চল। বংশধারাকেন্দ্রিক নানা নাম আমরা এই সময়ের উল্লেখ করে লিখিত বিভিন্ন ধরনের উৎসে পাই। সে সম্পর্কে তোমরা উপরের ক্লাসে জানতে পারবে। আমাদের বাংলাদেশ এবং বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলা আর বিহারের একটা বড় অংশ মিলে সম্ভবত মগধ ও অঙ্গ মহাজনপদ বিস্তৃত ছিল।



ମୌର୍ୟ ସାମ୍ବାଜ୍ୟର ବିଷ୍ଟତି



দ্বিতীয় নগরায়ণের সময় ভারত উপমহাদেশের উত্তরাংশে (গঙ্গা-যমুনা অববাহিকার) প্রধান প্রধান নগর কেন্দ্র



মৌর্য সাম্রাজ্যের আগে থেকেই উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথসহ কয়েকটি স্থলপথে বিভিন্ন বাণিজ্য ও নগরকেন্দ্রগুলো যুক্ত ছিল। সেগুলোর মধ্যে যোগাযোগ এই পথ ধরেই হতো। [উৎস : উপিন্দ্র সিংহের বইয়ের মানচিত্র থেকে রূপান্বিত]

চলো আমরা আমাদের বৌদ্ধধর্মের বন্ধুদের কাছ থেকে/ বৌদ্ধধর্মের বই থেকে জাতকের গল্ল শুনে অথবা পড়ে নিই।

তোমার জানা এমন কোনো গল্ল যা তুমি কোনো লিখিত উৎস থেকে পড়েনি কিন্তু বাড়ির বড়দের মুখ থেকে শুনেছ এমন একটি গল্লের লিখিত রূপ দিয়ে দেখো তো শোনা গল্ল থেকে কোনো কিছু তোমাকে পরিবর্তন করতে হয় কিনা?





দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নগর, বাণিজ্যকেন্দ্র, বন্দর, কারিগরি পন্য উৎপাদনের কেন্দ্র। [উৎস : উপিন্দুর সিংয়ের বইয়ের মানচিত্র থেকে বৃপ্তান্তিত]

এই সময় দুই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল। একটির নাম ছিল গণ ও সঙ্গ। এখানে অভিজাত ক্ষত্রিয় শ্রেণির কিছু সদস্য ওই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ করত। আইন-কানুন, রীতি-নীতি ঠিক করত। আরেকটি ছিল রাজ্য, যেখানে রাজাই ছিলেন প্রধান কর্তা। বিভিন্ন মহাজনপদ এক বা একাধিক গোত্র হিসেবে বা সঙ্গ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করতো। সমাজের বিভিন্ন স্তরে তখনও শ্রেণিবিন্যাস ছিল। ছোট বা বড় ভেদাভেদ ছিল। অরণ্য বা বনবাসী মানুষকে ছোট ভাবা হতো। আরও নানারকম ভেদাভেদ ছিল। তবে ব্রাহ্মণদের দাপট ও নিয়ন্ত্রণ তখনো সকল মহাজনপদে ও জনপদে বিস্তৃত হয়নি। বিশেষ করে মগধ, অঙ্গ, বিদেহসহ পূর্বদিকের মহাজনপদগুলোতে। গণ বা সঙ্গেও তাদের মর্যাদা কর ছিল।

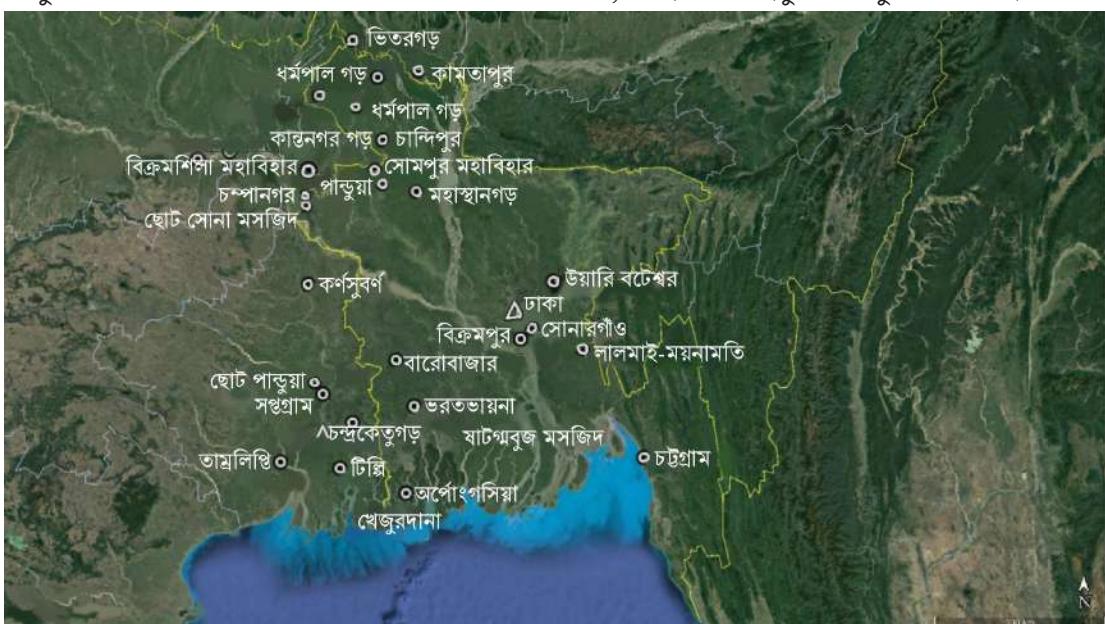
গণ বা সঙ্গের এই নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজার শাসনকেন্দ্রিক এবং রাজবংশকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিস্তৃত হয়। এই শাসনব্যবস্থাই সবচেয়ে বড় আর শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে রাজবংশের শাসনামলে তারা মৌর্য নামে পরিচিত।

মৌর্য রাজবংশের শাসন ভারত উপমহাদেশে এককেন্দ্রিক রাজত্বের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ভারত উপমহাদেশের বেশির ভাগ অংশেই এক শাসকের কর্তৃত নির্ভর এককেন্দ্রিক একটি সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজত্বের কেন্দ্র ছিল ভারত উপমহাদেশের পূর্বদিকে অবস্থিত মগধ নামক মহাজনপদটি। রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র (বর্তমান ভারতের বিহারের পাটনা)। যার সময়ে মৌর্য রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সবচেয়ে শক্তিশালী হয় তিনি হলেন সত্রাট অশোক। সত্রাট অশোকের নাম ও খ্যাতি বিভিন্ন কারণে এখনও আমরা মনে করি। তিনি প্রথমে যুদ্ধ করলেও কলিঙ্গের (বর্তমান ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের একাংশ) সঙ্গে যুদ্ধের সময় মৃত্যু ও শোক দেখে মনঃকষ্টে ভোগা শুরু করেন আর পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কারণ, বৌদ্ধধর্ম অহিংসার কথা ও সকল জীবকে ভালোবাসার কথা বলত।



সত্রাট অশোকের সময়ে স্থাপিত একটি স্তম্ভে লিখিত লিপি

অশোকের নাম ও কাজ সম্পর্কে জানার জন্য এবং তার সময়ের মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা জানার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে অশোকের বিভিন্ন বাণী বা কথা খোদাই করা স্তম্ভ লিপি এবং প্রস্তর লিপি। মৌর্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি তার বাণী খোদাই করা এসব লিপি স্থাপন করেন। এই লিপিগুলো অশোকের ধর্ম (প্রাকৃত ভাষায় ধর্মকে ধর্ম বলা হয়) বিভিন্ন নীতি, মানুষের জন্য কাজ আর ধর্মের বাণী লিখিত হয়েছে। তিনি তাঁর সপ্তম প্রস্তরলিপিতে, যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, পরিচয়ের আর মতের মানুষের মধ্যে চিন্তার অমিল থাকলেও পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ ও সহিষ্ণুতার অনুরোধ করেছেন।



বাংলাদেশের ও বাংলা বদ্বীপ অঞ্চলের বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি প্রত্নস্থানের অবস্থান।

মৌর্য রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো ও বিন্যাস পরিকল্পিত এবং সুশৃঙ্খল ছিল। কেন্দ্রীয় প্রশাসন, বিচারক, কর আদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নামের পদে আসীন ব্যক্তি ছিলেন। প্রাদেশিক এবং প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত আরও ছোট এলাকার জন্যও আলাদা আলাদা পদে নিয়োজিত কর্তা ছিলেন। ওই সময় বা তারও পরে পুঁজি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় যা মগধেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল তখন। বঙ্গ নামক একটি স্থানের নাম আরও পরের বিভিন্ন উৎসে পাওয়া যায়।

এই সময়েই ভারত উপমহাদেশের গঙ্গা-যমুনা অববাহিকায় এবং দক্ষিণ ভারতে অসংখ্য নগরকেন্দ্র বিকশিত হয়। হরিষ্মা সভ্যতার পরে একটা দীর্ঘ সময়ের বিরতির পরে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে এমন অনেক নগরকেন্দ্রের বিকাশকেই ঐতিহাসিকগণ দ্বিতীয় নগরায়ণ নামে ডাকেন। এই নগর ও নগরজীবনের নানা দিক নিয়ে অনেক বর্ণনা বিভিন্ন লিখিত উৎসে পাওয়া যায়। বড় হয়ে তোমরা সেগুলো পড়ে আনন্দ পাবে।



বর্তমানে ভারতের বৈশালীতে অবস্থিত বৌদ্ধস্তুপ এবং একটি অশোক-স্তম্ভ। বৌদ্ধস্তুপ হলো একধরনের স্থাপত্য। গৌতম বুদ্ধের পরলোকগমনের পরে তার দেহভস্ম বিভিন্ন স্থানে নিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই দেহভস্মের

উপরে এমন অর্ধগোলাকার স্থাপনা নির্মাণ করা শুরু হয়। তারপরে পুণ্য অর্জনের জন্য, বিভিন্ন সাধক ও বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ প্রচারক-শিক্ষক-চিন্তাবিদদের দেহভস্মের উপরে অথবা প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের বৌদ্ধস্তুপ তৈরি করা হতো। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে বৌদ্ধস্তুপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মাচার পরিচালনা করার স্থান। মাটি দিয়ে, পাথর দিয়ে, পাথর কেটে ভারত উপমহাদেশ ও উপমহাদেশের বাইরেও এই স্তুপ

তৈরি করা ও উপাসনা করার রীতি প্রচলিত হয়। আর সন্ন্যাট অশোক তার সান্নাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্তম্ভ বানিয়েছেন। স্তম্ভগুলোতে সন্ন্যাট অশোকের প্রচারিত বিভিন্ন বাণী ও বিধি-বিধান লেখা থাকত। এসব স্তম্ভের

উপরের অংশ সিংহ ভাস্কর্য, ধর্মচক্রসহ বিভিন্ন ধরনের অলংকরণ ছিল। এছাড়া, পাথরের উপরে খোদাই করে লিখিত বাণী, বিধি-বিধান, উপদেশও বিভিন্ন স্থানে অশোক স্থাপন করেন। এই লিপিগুলো সেই সময়ের ইতিহাসের দারুণ গুরুত্বপূর্ণ দলিল।



ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সম্মাট অশোকের স্তম্ভ ও প্রস্তর লিপি [উৎস : উপনিদর সিংয়ের বইয়ের মানচিত্র থেকে রূপান্তরিত]

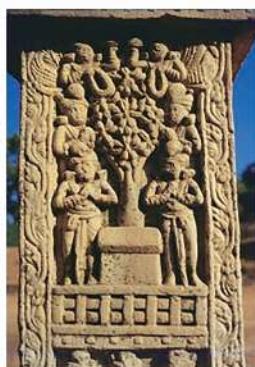
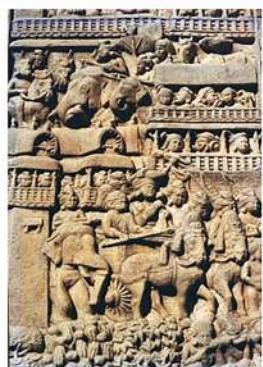
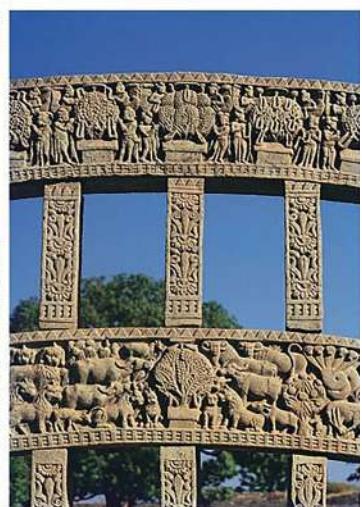
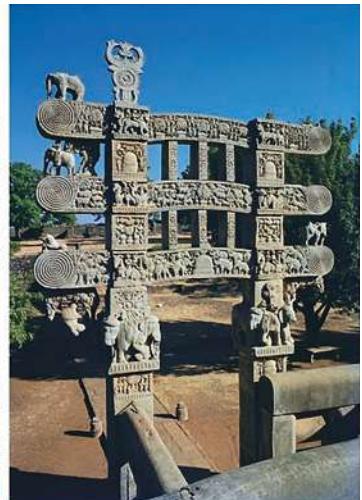
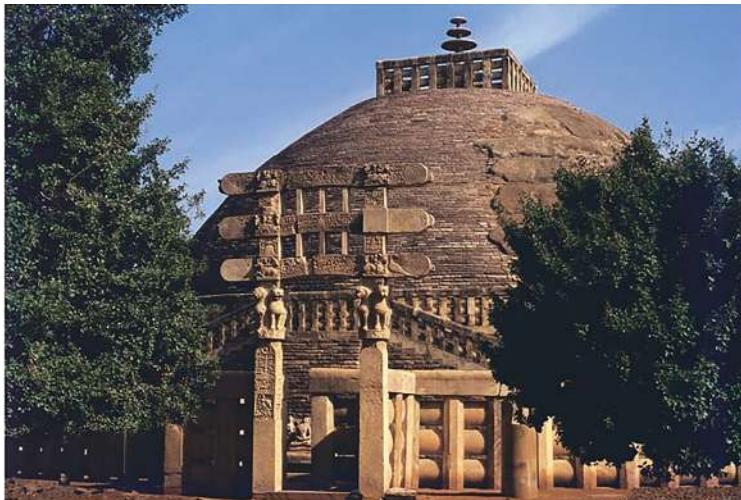
আজকের বাংলাদেশ আর ভারতের পশ্চিম বাংলা ও বিহার মিলিয়ে সেই সময়ের মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকে অনেকগুলো নগরকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলাদেশের বগুড়ার মহাস্থানগড় এবং নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর। মহাস্থানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মীলিপি খোদিত প্রস্তরখণ্ডটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



মহাস্থানের একজন কৃষক এই চুনাপাথরের ব্রাহ্মীলিপিতে লেখাটি আবিক্ষার করেন। লিপিটি মৌর্য রাষ্ট্রে প্রশাসন কর্তৃক প্রশাসনের জন্য নানা ধরনের সাহায্য করার উদাহরণ। লিপিটিতেই সবচেয়ে পুরোনো প্রমাণ হিসেবে পুঁজনগরের নাম পাওয়া যায়। বন্যার মতন দুর্যোগে অনুদান হিসেবে ধান ও টাকা প্রদানের একটি অনুসরণীয় উদাহরণ যে হাজার হাজার বছর আগেও ছিল এই বাংলা অঞ্চলে ছিল তার প্রমাণ এই লিপি।



বগুড়াচালিত রথে চড়ে সন্তান অশোক যাচ্ছেন।



ভারতের মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত বিখ্যাত স্থাপনা হলো সাঁচি নামক স্থানে
অবস্থিত বিভিন্ন বৌদ্ধ স্তূপ এবং সেই স্তূপগুলোর তোরণে ও গায়ে খোদাই করা
বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য



মৌর্য সাম্রাজ্য ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজ্যের এবং মগধ নামের জনপদের রাজধানী ও প্রধান নগরকেন্দ্র ছিল পাটলিপুত্র। ভারতের বিহার রাজ্যের রাজধানী পাটনায় এই পাটলিপুত্র নগরের অবস্থান ছিল। শিল্পীর চোখে সেই সময়ের পাটলিপুত্র নগরের স্থাপনা, মন্দির ও রাস্তা।

মহাস্থানগড়। এই দেয়াল ঘেরা স্থানটিই একটি নগর ছিল। সেই নগরের কাল্পনিক চিত্র। এই চিত্রে ওই দুর্গে প্রবেশ করার দরজাগুলো, নগরের মধ্যে জলাধারসহ চারদিকে পরিখা ও ডান দিকে করতোয়া নদী প্রবাহিত ছিল। করতোয়া নদীর তীরেই বগুড়ার মহাস্থানে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নগর মৌর্যদের সময় থেকে মোগল আমল অব্দি বসতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বিভিন্ন আমলে এই নগরের বৈশিষ্ট্য ও বসতি পরিবর্তিত হয়েছে।



মহাস্থানগড়ের ওই সময়ের নাম ছিল পুড়নগর। দুটো নগরকেন্দ্র থেকেই ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান এবং উপমহাদেশের বাইরের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নগরগুলো ছিল উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। নগরের বাইরেই বিভিন্ন বসতি ও স্থাপনা ছিল।

ভারতের পশ্চিমবাংলার দক্ষিণে চন্দ্রকেতুগড় এবং তাম্রলিপ্তি আর উত্তর দিকে বানগড় ওই সময়ের ছোট ও বড় নগরের ধ্বংসাবশেষ বহন করে। তাম্রলিপ্তি ছিল একটি বড় সমুদ্রবন্দর। কেন্দ্রীয় শাসন ও সরকার, কর ও রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও ব্যক্তি, আইনি ব্যবস্থাপনা – সব কিছু মিলিয়ে মৌর্য রাষ্ট্রব্যবস্থা বাংলাসহ একটি বিশাল অঞ্চলজুড়ে শাসন ও কর্তৃত বিস্তার করেছিল। এই সময়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়, জৈন সম্প্রদায়সহ আরও নানান ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং সংসার ও বিষয় ত্যাগী শ্রামণিক (যারা সংসার ও বিষয় বাসনা ত্যাগ করে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করেন, বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে অথবা সঙ্ঘবন্ধভাবে থেকে মানুষের দানের মাধ্যমে জীবনযাপন করেন তারাই শ্রমণ) ধর্মগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

নগরায়ণ (Urbanization):

নগরায়ণ বা শহরায়ণ বলতে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে অঞ্চলে জনসংখ্যার স্থানান্তর, গ্রামের তুলনায় নগর অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের অনুপাত ক্রমশ বৃদ্ধি এবং কোনো সমাজ যেভাবে এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় তা বোঝায়।





মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পরে ভারত উপমহাদেশে তৈরি হওয়া বিভিন্ন রাজ্য বা রাজত্ব। [উৎস : উপিন্দির সিংহের বইয়ের মানচিত্র থেকে রূপান্তরিত]



এ চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া লিপিসহ সিলমোহরে নানা ধরনের জাহাজের ছবি।



ছাপাঞ্জিত রূপা আর তামার মুদ্রা। বিভিন্ন প্রতীক রয়েছে। মহাস্থানগড়, উয়ারী-বটেশ্বরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এমন ধরনের মুদ্রা পাওয়া গেছে। চলো আমরা এসব মুদ্রা এবং তোমার দেখা অন্য আরো কিছু মুদ্রার ছবি আঁকি।



স্বার্ট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র বা সভাসদ ছিলেন কৌটিল্য। তার লেখা অর্থশাস্ত্র সেই সময়ের অর্থনীতি-রাজনীতি-যুদ্ধনীতি-শাসনরীতি-সমাজ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কৌটিল্যের লেখার পরে অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রতিলিপি হাতে তালপাতা ও কাগজে লিখে সংরক্ষণ ও প্রচার করা হয়েছিল। অর্থশাস্ত্রের তেমনই একটি প্রতিলিপির ছবি এখানে দেওয়া হলো।



পশ্চিম বাংলার চন্দ্রকেতুগড় থেকে শুঙ্গ শাসনামলে শিল্পী ও কারিগরদের তৈরি করা পোড়ামাটির ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। তেমনই ফলকে সেই কালের সাধারণ মানুষের জীবন। এটিতে বাঁকে করে কলসে জল বা দুধ বা অন্য কিছু বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন তিনজন পুরুষ। ফলক আংশিক ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

সামাজিক ক্ষেত্রেও নানা ধরনের বদল আসে। ধনী, গরিব, দাসসহ বিভিন্ন শ্রেণি তৈরি হয়। একটি নির্দিষ্ট গোত্র বা বংশধারা কিংবা নির্দিষ্ট পেশাজীবী দলের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। এই দলটিই কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয় একটি আলাদা জাতিবর্গ হিসেবে। এদের একটা বড় অংশ বেদ এবং বেদকেন্দ্রিক নানা ধরনের শাস্ত্র প্রবর্তন করেন, প্রচলন করেন। আর যারা এই শাস্ত্রগুলো অনুসরণ করতেন না তাদের নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বিশেষ বংশধারার নেতৃত্ব শুরু হয়।

এই সময়েও কিন্তু ভারত উপমহাদেশের বাইরে থেকে নানা মানুষ গোত্রবন্ধুত্বে বাণিজ্যের জন্য, যুদ্ধের জন্য, বসতি স্থাপন করার জন্য এসেছে। বর্তমান আফগানিস্তান হয়ে মধ্য এশিয়া, গ্রিস, পারস্য থেকে মানুষ এসেছে। রেশম পথ (সিঙ্গ রোড নামে পরিচিত) নামে যে দীর্ঘ একটি স্থল বাণিজ্যপথ চীনের মধ্য দিয়ে মধ্য এশিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেই পথের সঙ্গে ভারত ও বাংলার নানা অংশ যুক্ত ছিল। রেশম পথ নাম হলেও কেবল উন্নতমানের সিঙ্গ বা রেশমবন্দ নির্ভর বাণিজ্যই এই পথে চলতো না। তোমরা হয়তো ক্যারাভান শব্দটি শুনেছ। ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি, বা গরুর গাড়ি মিলিয়ে যখন বণিকগণ দুর্গম বা সুগম স্থলপথ দিয়ে বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করতেন সেই পরিবহনকে বলে ক্যারাভান।



মহাস্থানগড়ে খননে পাওয়া লোহার তৈরি বিভিন্ন অস্ত্র। বিশেষ করে তীরের ফলা।

চলো একটি ক্যারাভানের ছবি এঁকে ফেলি।

গ্রিসের সম্মাট আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এ সময় ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমের কিছু অংশ যুক্তের মাধ্যমে দখল করে নেন। তিনি গ্রিস থেকে সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য দেশের পর দেশ অধিকার করতে করতে ভারত উপমহাদেশ অদি পৌছান। কিন্তু নদী ও নানা কারণে তিনি উত্তর ভারত ও পূর্ব দিকে আগাতে ব্যর্থ হন। কিন্তু তার এই অভিযানের সুদূরপশ্চাত্য প্রভাব ছিল। এই অভিযানের ফলে নতুন নতুন যোগাযোগ, অভিবাসন ও বাণিজ্যের পথ খুলে যায়। পরের ইতিহাসে এই অভিযানের প্রভাব দেখতে পাবো। বিভিন্ন ভাষা, আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মবিশ্বাস, জীবনযাপনের মধ্যে যোগাযোগ, বিনিময় আর একের অপরকে প্রভাবিত করার যে প্রক্রিয়া প্রাণীতিহাসিক আমল থেকেই শুরু হয়েছিল, তা চলতে থাকে।

অন্যদিকে নদী ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য ও যোগাযোগ এসময়ে একদিকে রোমান সাম্রাজ্যের নানা কেন্দ্রে, অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে চলতে থাকে। এই যোগাযোগের প্রক্রিয়াটা সব সময় সরাসরি ছিল না। এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে, সেই বন্দর থেকে অন্য এক বন্দরে— এভাবে বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ ও সংগ্রহ করা হতো। নাবিক ও বণিকগণ সামুদ্রিক বায়ু, আকাশের তারা আর সমুদ্রস্তোত্রের উপরে নির্ভর করে তখন দূরের এই যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

বাংলার ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য অনন্য ছিল আর এখনও আছে, সেটা হলো এখানকার নদীব্যবস্থা। জালের মতন বিস্তৃত নদীনালা, পানি আর জমির বৈশিষ্ট্য যেমন যোগাযোগে সুবিধা দিয়েছিল, তেমনই বাইরের এই ধরনের পরিবেশের সঙ্গে অপরিচিতদের অসুবিধার কারণও ছিল।

নদী, স্থল আর দক্ষিণের সমুদ্র মিলিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশের চাষাবাদ-বাণিজ্য-যোগাযোগ-ব্যবসাকেন্দ্র পরিচালিত হতো। আমাদের অঞ্চলের আরেকটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো মৌসুমি বায়ু ও বৃষ্টিপাত।



মহাস্থানের অবিভক্ত বাংলা থেকে পাওয়া
পাথরে খোদাই করা সমুদ্রগামী জাহাজের মডেল

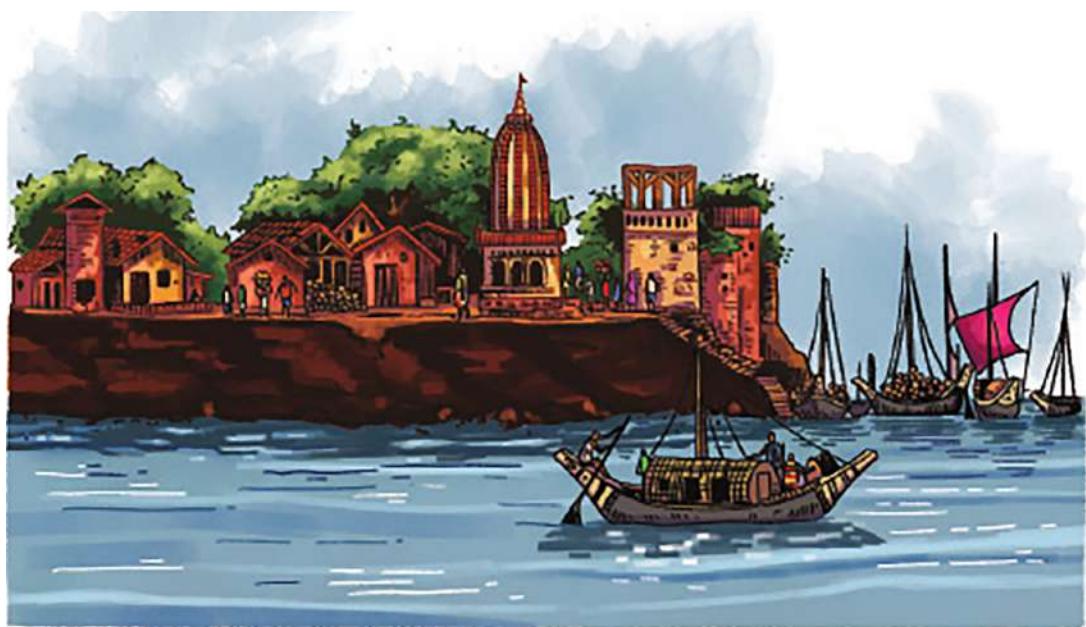
নদী (River):

নদী সাধারণত মিষ্টি জলের একটি প্রাকৃতিক জলধারা যা ঝরনাধারা, বরফগলিত স্রোত অথবা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে প্রবাহ শেষে সাগর, মহাসাগর, হৃদ বা অন্য কোনো নদী বা জলাশয়ে পতিত হয়।





সমুদ্রগামী জাহাজের কাল্পনিক চিত্র। এ ধরনের জাহাজে তৎকালীন আরবীয় বণিকরা ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্য করতেন



নদীর তীরে অবস্থিত একটি নগর আর নৌকা। বাংলাদেশের পুড়নগরকে কল্পনা করে আঁকা (সূত্র: সুজা-উদ-দৌলার চিত্রের রূপান্তর)



দড়ি আর কাঠ দিয়ে এমন জাহাজ তৈরি করতে হতো। বাংলা ও উড়িষ্যা অঞ্চলে।



সমুদ্রগামী জাহাজের পুনর্নির্মিত ছবি। বাংলা ও উড়িষ্যাসহ বিভিন্ন জায়গার বন্দর থেকে এখরনের জাহাজে সমুদ্রবাণিজ্য পরিচালিত হতো।

আমরা কতো কতো নৌকা বা জাহাজের ছবি ও মডেল দেখলাম। চলো এবার একটা মজার কাজ করি। মাটি অথবা কাগজ দিয়ে ঐ সব নৌকা ও জাহাজের মডেল বানিয়ে বন্ধুদের দেখাই।

মৌসুমি বায়ু দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে সর্বাগেক্ষা প্রভাব বিস্তারকারী বায়ুপ্রবাহ। গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে সমুদ্র ও ভূগৃহের উভাপ এবং শীতলতার তারতম্যের ফলে ঝুতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হয়। এই পানি, নদী আর জমির চেহারা বছরের বিভিন্ন সময়ে তাই বদলে যেতো। বর্ষাকালে একরকম, শীতকালে একরকম, গ্রীষ্মকালে একরকম। এই পরিস্থিতি বাইরের বিভিন্ন রাজা, শাসক বা অভিযানকারী বাহিনীকেও বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা করা, এখানকার জমি অধিকার করা, এখানে বিভিন্ন এলাকায় কর্তৃত বজায় রাখা কঠিন ছিল। নদীপথে যুদ্ধ পরিচালনা করার ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন না করলে, বৃষ্টির মধ্যে, বন্যার মধ্যে যুদ্ধ করার যোগ্যতা না থাকলে এই এলাকায় হামলা করা, কর্তৃত করা আর শাসন করা অসম্ভব ছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করতেও এই প্রকৃতি, বৃষ্টি আর নদী বিরাট ভূমিকা রেখেছিল।

উত্তরের হিমালয় পর্বত ও সংলগ্ন এলাকায় বর্ষাকালে যে বৃষ্টিপাত হতো, সেই বৃষ্টির পানি এখনকার মতন তখনও বাংলাদেশের নদীনালা দিয়ে নিঙ্কাশিত হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পলি বহন করে নিয়ে যেতো। বর্ষাকালের বাণিজ্য ও যোগাযোগ আর শীতকালে যখন নদীতে পানি কম থাকতো বা কোনো কোনো নদী শুকিয়ে যেতো, তখন যোগাযোগের ধরনে পার্থক্য ছিল। এই বৃষ্টি ও পলির সঙ্গে চাষাবাদের সম্পর্ক যে কতোটা গভীর ছিল আর এখনও আছে, সেটা তোমরা সবাই জানো। আমাদের দেশে ধান চাষ আর আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত হওয়ার পিছনেও এখনকার বৃষ্টিপাত, নদী, পানির সঙ্গে জমির সম্পর্ক একটা কারণ। তোমরা জেনে অবাক হবে যে, সাধারণ পূর্বাব্দ চতুর্থ-তৃতীয় শতকে বাংলা অঞ্চলের অন্যতম প্রধান নগর ও বন্দর বর্তমান পশ্চিম বাংলার চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া পোড়ামাটির ফলকে ধান কাটার চিত্র খোদাই করা পাওয়া গেছে। আরও পাওয়া গেছে তৎকালীন নৌকা ও জাহাজের চিত্র। পরিবেশ,



ভারতের পশ্চিম বাংলার চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া
ভাস্কর্যে প্রাক সাধারণ চতুর্থ-তৃতীয় শতকে ধান
কাটার দৃশ্য



উয়ারী-বটেশ্বরে আবিস্কৃত বিভিন্ন স্বল্প মূল্যের
পাথরের পুঁতি



মহাস্থানের নিকটে বসতির কাল্পনিক চিত্র।

পানি, নদী ও প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে আবাদ করা, যোগাযোগ করা আর বাণিজ্য পরিচালনা করার এমন উদাহরণ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বাংলাদেশসহ বাংলা অঞ্চলের মানুষ যে কেবল চাষাবাদ করতো না; বরং ভারত উপমহাদেশের নানা অংশের সঙ্গে আর উপমহাদেশের বাইরেও নানা অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ও বাণিজ্য পরিচালনা করতো, তার নতুন নতুন প্রমাণ ইতিহাসবিদগণ আবিষ্কার করে চলেছেন।



মগধের আরেকটি বড় নগর এবং গৌতম বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত কুশীনগরের প্রধান প্রবেশ তোরণের কাল্পনিক চিত্র



মহাস্থানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিস্কৃত ইটের তৈরি রাস্তা। বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের প্রত্নতত্ত্ববিদগণের একটি দল এগুলো খুঁড়ে বের করেছেন।



উয়ারী বটেশ্বরে খননে আবিস্কৃত একটি জলাধার



মহাস্থানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিস্কৃত দুর্গের গোলাকার বুরুজ। বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের প্রত্নতত্ত্ববিদগণের একটি দল এগুলো খুঁড়ে বের করেছেন।

চলো এবারে আমরা মহাস্থানগড় ও উয়ারী বটেশ্বর থেকে কী কী জিনিস পাওয়া গেছে তার ছবি নিচের ছকে এঁকে ফেলি।

স্থান	নির্দর্শনসমূহ
ডঃ মাস্টার নগুর	
ডঃ বটেশ্বর গুরু	

সাম্রাজ্যের ভাঙ্ন, নতুন রাজ্য, সমাজের বদল

কোনো সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী নয়। অশোকের মৃত্যুর পরেই বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন নতুন বংশধারাকেন্দ্রিক রাজত্বের উত্থান শুরু হয়। মৌর্য শাসকদের নিয়ন্ত্রণ কর্মতে থাকে। নতুন রাজত্ব ও শাসকগণ নতুন নতুন রাজত্ব তৈরি করে প্রভাব বিস্তার করেন। আগের লক্ষ লক্ষ বছরের মতন ভারত উপমহাদেশের বাইরে বিভিন্ন স্থান বা অঞ্চল থেকে মানুষের আগমনের ধারাটি চলতে থাকে। অনেক সময় বাইরের কোনো কোনো গোষ্ঠী বা গোত্র বা বংশধারা ভারত উপমহাদেশের কোনো কোনো অংশের উপরে শাসন বিস্তার করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। ফলে মৌর্য শাসনের শেষ দিক থেকে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গোত্রের মানুষ প্রভাব বিস্তার করা শুরু করে। বর্তমান আফগানিস্তান থেকে ব্যাকত্রিয়-গ্রিকগণ, মধ্য এশিয়া থেকে শক-পল্লব (সিথো-পার্থিয়ান), কাছাকাছি অঞ্চল থেকেই কুশান (বা কুই-শ্যাং), পশ্চিম ভারতে শক-ক্ষত্রিপ, দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন, দক্ষিণ ভারতের প্রান্তে চেরা, চোলা ও পাঞ্জ রাজত্বের বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্য এশিয়া, চীনের প্রভাববলয় আর পারস্যের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী উপমহাদেশে আগমন করে আর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। মৌর্যদের সাম্রাজ্য ও প্রভাব না-থাকলেও রাষ্ট্র ও রাজ্য পরিচালনায় প্রশাসনিকে শ্রেণিবিন্যাস, বাণিজ্যিক যোগাযোগ আর বিভিন্ন স্থান নগর-কেন্দ্রের বিকাশ অব্যাহত থাকে। আমাদের একটা ধারণা আছে যে, একটি সাম্রাজ্য বা কেন্দ্রীয় রাজা বা সম্রাট ও প্রশাসনের অধীনে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজস্ব-কর আদায়, কৃষি জমির সম্প্রসারণ ও শস্যের উৎপাদন বাঢ়ে। কিন্তু যদ্যেও যে বাণিজ্য ও নগর-কেন্দ্রের বিকাশ চালু থাকতে পারে, তার প্রমাণ হলো এই সময়কাল।



গুপ্ত এবং সাতবাহন শাসনকালে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনের ও শাসকদের অবস্থান। যা সাম্রাজ্যে সময়ের সঙ্গে বিস্তৃত হয়েছে, আবার সংকচিত হয়েছে।

বিভিন্ন অঞ্চল দখল করা নিয়ে সংঘাতের পাশাপাশি পূর্ব বাইরের ও ভিতরের মধ্যের নানা ধরনের নতুন নতুন মানুষ-এলাকা-জীবন্যবস্থার যোগাযোগ তৈরি হয়। বিভিন্ন জায়গার মানুষ ব্যবসা, পর্যটন, ধর্মমত প্রচারের জন্য অনবরত আগমন করতে থাকেন। ভারত উপমহাদেশ থেকে বৌদ্ধ শ্রমণগণ চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশ, আফগানিস্তান হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে ধর্ম প্রচারের জন্য গমন শুরু করেন। তবে যে মগধের প্রভাববলয়ের অংশ ছিল আজকের বাংলাদেশের বেশির ভাগ অংশ সেই অঞ্চলেও বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

শুঙ্গ রাজবংশ এই পরিবর্তনকে সমর্থন করেছিল। অন্যদিকে কুশান রাজবংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও তাদের প্রধান এলাকা ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারত উপমহাদেশ (আজকের পাকিস্তান, আফগানিস্তানের অংশ বিশেষ এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ)। বাংলাদেশে শুঙ্গ ও কুশানদের প্রভাব কতোটা ছিল তা এখনো সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়নি। তবে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে ধারণা করা হয়, এ সময়েও এই নগরীতে মানুষের বসবাস এবং কাজকর্ম অব্যাহত ছিল। তবে এই নগরী কুশান বা শুঙ্গদের অধীন ছিল কি না, সেটা নিশ্চিত না। মৌর্যদের সময় এই পুড়নগর যেভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরকেন্দ্র ছিল প্রশাসনিকভাবে সেভাবে এই সময় এই নগরের মর্যাদা ছিল কি না, তা-ও স্পষ্ট না। কিন্তু মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বর যে বাণিজ্য এবং মানুষের বসবাসের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে তাদের অবস্থান অটুট রেখেছিল, তা বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে ধারণা করা যায়।



কুশান সম্রাট তৃতীয় কণিক্ষের সময়ে জারি করা সোনার মুদ্রা



কুশান সম্রাট হবিক্ষের সময়ে জারি করা সোনার মুদ্রা



বাংলাদেশের মহাস্থানগড় বা প্রাচীন পুরনগরের আকাশ থেকে তোলা ছবি। চারপাশে পরিখা (নালার মতো খাদ, যাতে পানি থাকতো।) ঘেরা দুর্গপ্রাচীর ঘেরা ছিল নগরকেন্দ্রটি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কুষান সম্রাটদের সময়ে জারি করা মুদ্রা এবং শুঙ্গদের সময়ে পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ ওই রাজত্বের অংশ থাকার কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পান্বয় হিসেবে এসব মুদ্রা ও চিত্রফলক এই নগরীতে আসতে পারে। ভারতের পশ্চিম বাংলার চন্দ্রকেতুগড়ে শুঙ্গ শাসনামলের সমসাময়িক পোড়ামাটির চিত্রফলক পাওয়া গেছে অনেক। কিন্তু ওই নগরী শুঙ্গ শাসনের অধীন ছিল কি না, তা বোৰা মুশকিল। ইতিহাসে এমন অনিশ্চয়তা বা প্রশ্ন থেকেই যায়।

প্রশাসন, সামন্ত আর রাজত্ব: সাম্রাজ্যের ফিরে আসা

ভারত উপমহাদেশের নানা রাজ্য ও শাসনে বিভক্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাংশের অঞ্চল আবারও একটি বিরাট এলাকাজুড়ে শাসন বিস্তৃত হয় সাধারণ অন্দ তৃতীয় শতকের দিকে। নতুন এই রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য গুপ্ত সম্রাটগণ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতেন। এই সাম্রাজ্যের অধীনে করদ বা অধীনস্থ ছোট ছোট রাজ্যও ছিল। অন্যদিকে, ভারত উপমহাদেশের দক্ষিণে বকাতক রাজাদের শাসনাধীনে আরেকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।



গুপ্ত যুগের সোনার মুদ্রার নমুনা

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, বিশেষ করে বর্তমান দিনাজপুর জেলা থেকে গুপ্ত সম্রাটদের জারি করা বেশ কয়েকটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। এগুলো প্রখনত জমি বেচাকেনার দলিল। এ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে গুপ্ত সম্রাটদের জারি করা বিভিন্ন ধরনের সোনার মুদ্রা পাওয়া গেছে। তখন এই সোনার মুদ্রাব্যবস্থার নাম ছিল দিনার। তবে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে আরও নানা ধরনের বিনিময় পদ্ধতি ব্যবহার করতো। বিভিন্ন লিখিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস থেকে এই সময়ের সমাজ, প্রশাসন, বাণিজ্য, কৃষি, করব্যবস্থা সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য জানা যায়। বড় হয়ে তোমরা সেগুলো ভালোভাবে জানতে পারবে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় রাষ্ট্র খুব স্তরবিন্যস্ত প্রশাসনিক ও রাজস্বব্যবস্থার অধীনে ছিল। সাম্রাজ্যকে ভাগ করা হয়েছিল প্রদেশে। এগুলোর নাম ছিল দেশ বা 'ভূক্তি'। প্রদেশের অধীনে ছিল যে এলাকা, তার নাম ছিল 'বিষয়'। বিষয়ের অধীনে ছিল 'বীথি' বা



গুপ্ত যুগের পোড়ামাটির ভাস্কর্য। এগুলো মানুষের স্বাভাবিক আকারের মতন বড়।

পট্ট বা পঠক বা পেট্টা। সবার নিচে ছিল 'গ্রাম'। আমাদের আজকে যেমন প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তা থাকেন, তখনও তেমন কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাদের সভা ছিল। তার নাম ছিল অধিকরণ। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নাম ও পদবি ছিল। যেমন ধরো, বাংলাদেশে পাওয়া একটি তাম্রলিপি অনুসারে পুঁজুবর্ধন ভূক্তির (মোটামুটিভাবে বর্তমান রাজশাহী, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও আর ভারতের পশ্চিম বাংলার সংলগ্ন অঞ্চল) অধীনস্থ কোটিবর্ষ বিষয়ের (বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বানগড়কে এই বিষয়ের কেন্দ্র মনে করা হয়) অধিকরণে ছিল: বিষয়পতি বা উপরিক (প্রধান কর্মকর্তা), নগর-শ্রেষ্ঠী (নগরের প্রধান বণিক বা তখনকার মহাজন), স্বার্থবাহ (যারা ঘোড়া বা



গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ঘোড়ায় চড়া প্রতিকৃতি
খোদিত সোনার মুদ্রা



গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রতিকৃতি অঙ্গিত
সোনার মুদ্রা



গুপ্ত যুগের মন্দির

গুরুর গাড়িতে বা স্থলপথে পরিবহন করতেন তাদের প্রধান), প্রথম-কুলীক (কারিগর বা ব্যবসায়ীদের প্রধান), প্রথম-কায়স্ত (নথি-দলিল লেখক বা রাজস্ব আদায়কারীদের প্রধান)। তাহলে তোমরা লক্ষ করবে যে, সেই সময়েও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উচু থেকে নিচ অব্দি বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের কাজের জন্য নানা পদে নিযুক্ত মানুষ ছিলেন। এ ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল।

এই সময়ে কৃষিকাজের যেমন প্রসার ঘটে তেমনই নানা অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও বিস্তার লাভ হয়। সেনাবাহিনীর জন্য আলাদা বরাদ্দ ও পেশার মানুষ ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধানত সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে ব্যবহৃত হওয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাষায় নানা সাহিত্য, আইন-কানুন আর লেখা পত্রও বেশ পাওয়া যায় এ সময়ের।



গুপ্ত যুগের পোড়ামাটির ফলক।



গুপ্ত আমলের তাত্ত্বিকি। জরি বিক্রির দলিল।



বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে পাওয়া গুপ্ত তাম্রলিপিগুলোর পাওয়ার স্থান। বেশ কয়েকটি গুরুতর্পূর্ণ প্রত্নস্থানের তালিকা।



অতীশ দীপঙ্কর



গুপ্ত আমলের গুহার ভাস্কর্য ও দেয়ালচিত্রের মধ্যে একটি গুহার ভাস্কর্য। পাথর কেটে গুহার মধ্যে এসব ভাস্কর্য খোদাই করা হয়েছে। সেই সময়ের শিল্পকর্ম ও প্রযুক্তির অসাধারণ উদাহরণ এগুলো।



ইলোরার একটি পাথর খোদাই করে তৈরি করা মন্দির



নালন্দা মহাবিহার (বর্তমান ভারতের বিহারে অবস্থিত) একটি বৌদ্ধ কেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয় গুপ্ত আমলে।



কালিদাস লিখিত মহাকাব্য মেঘদূত থেকে একটি দৃশ্য কল্পনা করে আঁকা হয়েছে। তিনি গুপ্তদের শাসনকালে এই কাব্য রচনা করেন।



মহাকবি কালিদাস কাব্য রচনা করছেন (কাল্পনিক চিত্র)। তার সময়কাল গুপ্ত শাসনকাল।

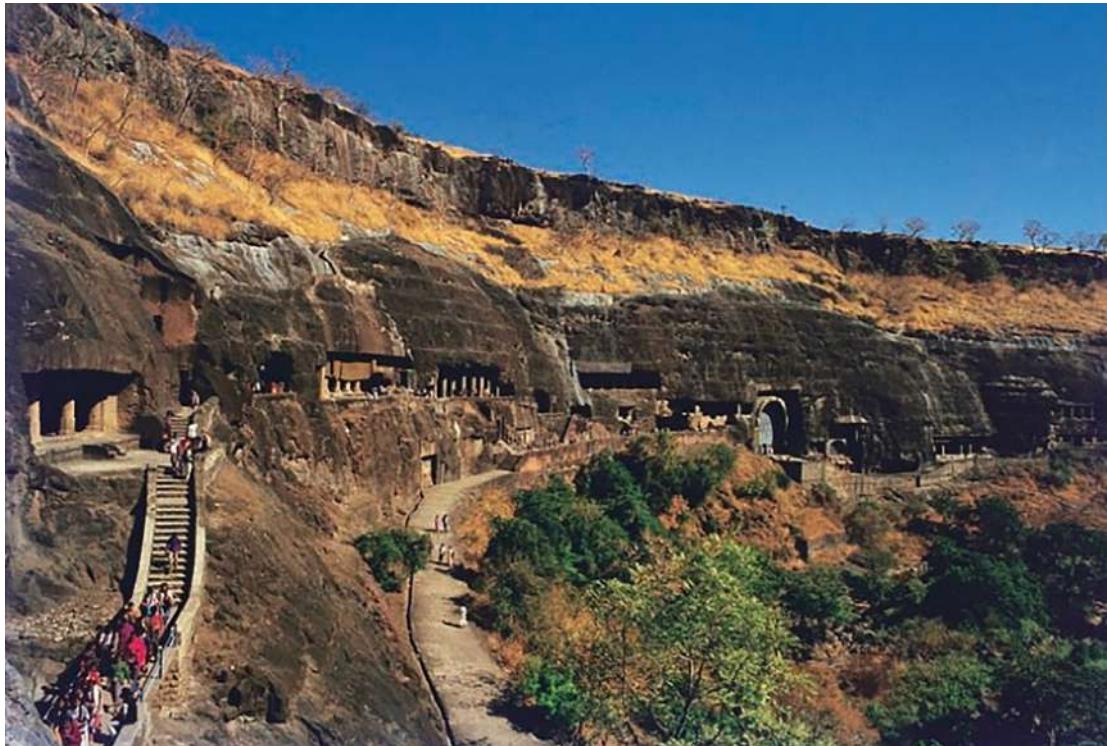


ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত গোতম বুদ্ধের প্রতিমা



অজন্তার গুহাচিত্র

চলো এখন আমরা সাম্রাজ্য গুলোর পর্যায়ক্রমিক তালিকা তৈরি করি এবং ঐ সম্রাজ্যগুলোর দুটি করে উল্লেখযোগ্য নির্দর্শনের নাম লিখি ও ছবি আঁকি।



অজন্তার গুহাগুলোর ছবি। পাহাড়ের মধ্যে কেটে এই গুহাগুলো শিল্পী ও কারিগরেরা তৈরি করেছিলেন



অজন্তার গুহাচিত্র

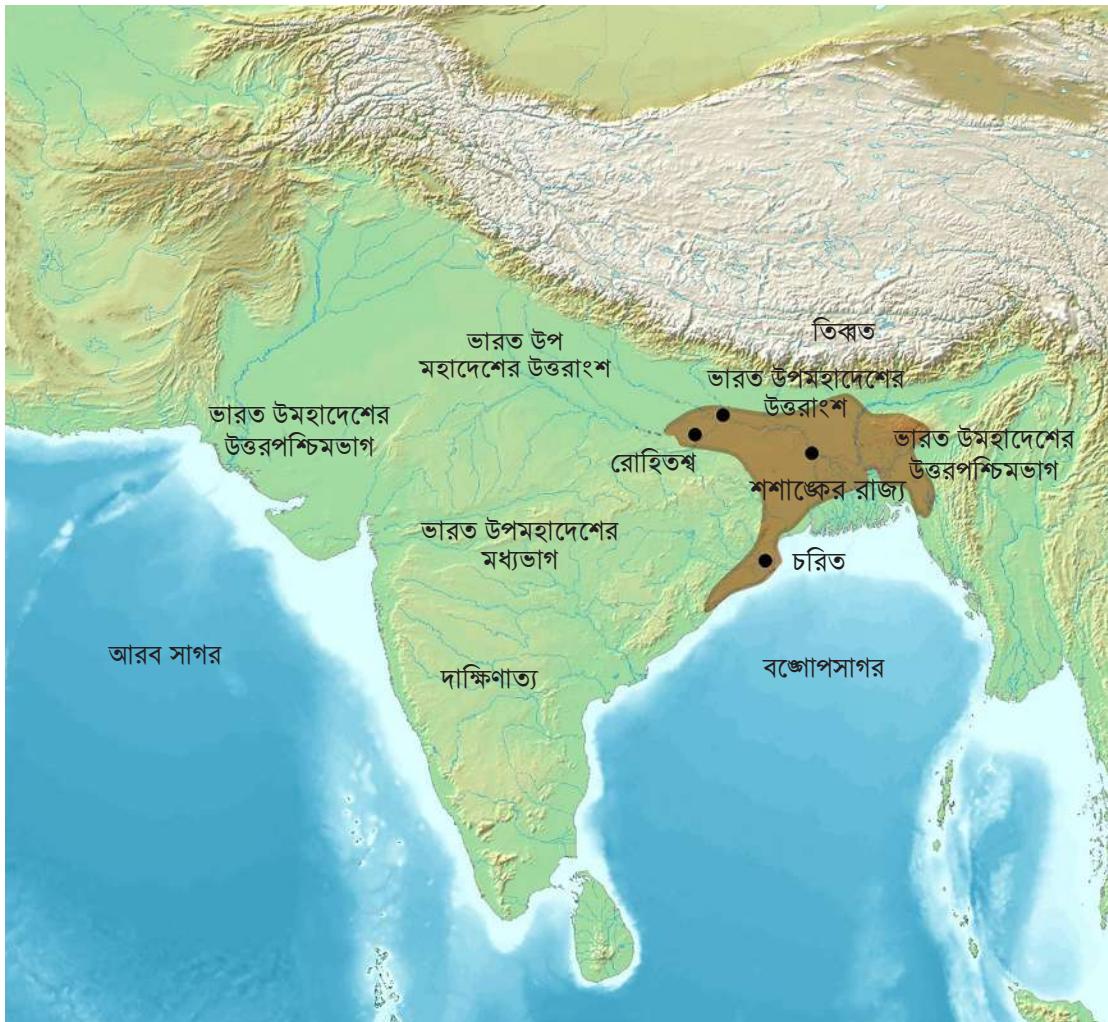
আঞ্চলিক পরিচয়, চাষাবাদের বিস্তার এবং তৃতীয় নগরায়ণ: যোগাযোগ, মিশ্রণ আর প্রতিযোগিতার পর্ব

উপ-অঞ্চল, রাষ্ট্র, সামন্ততন্ত্র আর তৃতীয় নগরায়ণ: বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক আঞ্চলিক পরিচয়ের উন্মেষ

এই সাম্রাজ্যেরও আস্তে আস্তে ভাঙ্গন হয়। ছোট ছোট রাজত্ব সৃষ্টি হয়। সম্রাটদের অধীনে বা সম্রাটদের প্রতি অনুগত যে বড় বড় জমি ও ক্ষমতার মালিক ছিলেন তাদের বলা হতো মহাসামন্ত, মহামাঞ্চলিক বা সামন্ত। এরা অনেকেই স্বাধীন রাজত্ব তৈরি করেন। বাংলা অঞ্চলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পরে নানা রাজবংশের শাসন বিস্তৃত হয়। এদের মধ্যে গোড় নামে যে রাজত্ব তৈরি হয়, সেই রাজত্ব বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরের বড় অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। গোড় নামটি পরেও দীর্ঘকাল বাংলা অঞ্চলের মানুষের পরিচয় হিসেবে বলবৎ ছিল। সাধারণ অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি আগেকার পুন্ডৰবর্ধন অঞ্চলে নতুন এক রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। অন্যদিকে, সমতট-হরিকেল-শ্রীহট্ট অঞ্চলে (বর্তমান কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম) নতুন বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান ঘটে। যেমন : খড়া, চন্দ্র, দেব ইত্যাদি। সেই সময়ে গোড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্গ (বর্তমানে ভারতের পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদে)।



শশাঙ্কের সময়ের গোড় রাজ্যের সমসাময়িক অন্যান্য রাজ্য ও রাজত্ব।



শশাঙ্কের রাজত্বের আনুমানিক বিত্তার। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশসহ ভারতের বিহারের পূর্বদিক, পশ্চিম বাংলার উত্তর ও দক্ষিণাংশের শশাঙ্কের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল।



গৌড়ের শাসক শশাঙ্কের মুদ্রা।

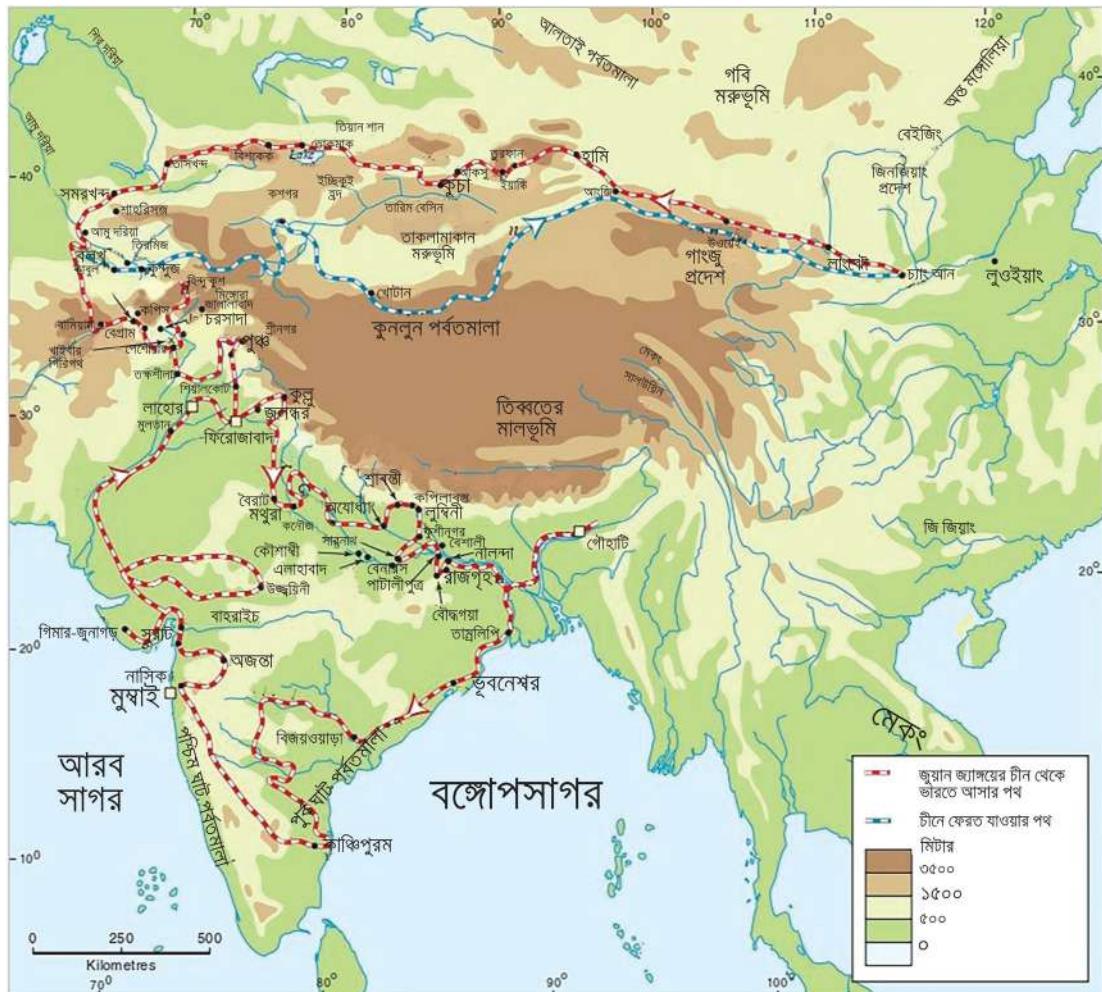
ভারত উপমহাদেশে তখন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক রাষ্ট্র বিকশিত হয়। রাজত্বের ভিত্তিতে এসব অঞ্চলকে বোঝার চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল হতে পারে। কারণ, সাধারণ অব্দ ৭ম-৮ম শতকের দিকেই বিভিন্ন জায়গায়ই ছোট ছোট অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট পরিচয়, ধর্মচার, আচার-আচরণ, সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে শুরু করে। এসব উপ-অঞ্চলের মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশে ছিল: বঙ্গ, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল, কামরূপের একাংশ। বর্তমান পশ্চিম বাংলার পড়েছে রাঢ়। উপ-অঞ্চলগুলোর কোনো কোনোটিতে একই শাসক থাকলেও মনে রেখো, শাসকের বা রাজার পরিবর্তন মানুষের জীবনযাপন, সমাজ ও পরিচয়ের উপরে একই রকম প্রভাব ফেলে না। একই শাসক এসব রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন এলাকার উপরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে যুদ্ধ ও সংঘাতে চলতে থাকে। যেমন: বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের অনেকাংশ জুড়ে পাল বংশীয় শাসকদের শাসন জারি হয়। বর্তমান ভারতের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে গুজর-প্রতিহার আর চান্দেলা, মধ্য ও পশ্চিমাংশে রাষ্ট্রকুট, দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে চোল, পাণ্ডি, হোয়সালা, পল্লব, কদম্ব, চের ইত্যাদি বংশের শাসন চলতে থাকে। একাধিক অঞ্চলের উপরে শাসন বিস্তার নিয়ে যুদ্ধ ও সংঘাতও চলতে থাকে। কিন্তু



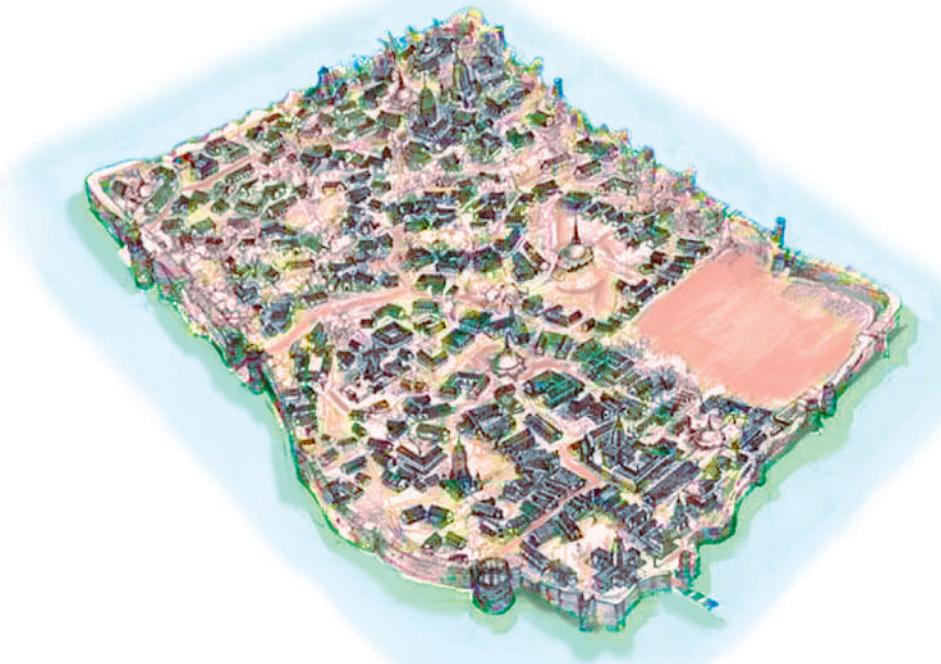
অবিভক্ত বাংলা ও সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ অষ্টম-নবম শতকে বিকশিত উপ-অঞ্চলগুলো।

এই সংঘাতের পাশাপাশি বাণিজ্য, কৃষিকাজ, নগরায়ণসহ নানা ক্ষেত্রে নতুন নতুন অনেক উভাবন ঘটতেও থাকে। বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য আর অন্যান্য ভাষ্য আর ধর্মশাস্ত্র বিকশিত হয়।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে সমতট-হরিকেল-শীহটজুড়ে চন্দ, দেব, বর্মনসহ বিভিন্ন রাজবংশের শাসন বিকশিত হয়। এ সময়ে এসব অঞ্চলে ব্রাক্ষণ্য ধর্মের বিভিন্ন মতবাদ (যেমন: বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌরীয় ইত্যাদি), বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন মতবাদ (যেমন: মহাযান, বজ্র্যান, থেরবাদী, সহজীয়া ইত্যাদি), জৈন ধর্মের নামা মতবাদ বিকশিত হয়। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভক্তিবাদ, তত্ত্বানসহ বিভিন্ন ধরনের মত ও পথের অনুসারীদের বিকাশ ঘটে। ভারতের অন্যান্য অংশে বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা কমে এলেও এবং পুরোনো অনেক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান যেমন: সঙ্গকেন্দ্রিক বৌদ্ধবিহার ও মহাবিহার গুরুত্ব হারাতে শুরু করলেও শাসকদের ও অনুগত সামন্ত আর মহাসামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশসহ তৎকালীন পূর্ব ভারতে বৌদ্ধ ধর্মীয় বজ্র্যান, তত্ত্বান, সহজীয়া মতের অনুসারী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়।



জুয়ান-জ্যাংয়ের সেই সময়ের ভারত উপমহাদেশ ও অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মস্থানে ভ্রমণ করা ও ফিরে যাওয়ার পথ [উপিন্দুর সিংয়ের বইয়ের মানচিত্র থেকে রূপান্তরিত।



কেমন ছিল সেই সময়ে পুঁজুনগরের ভিতরের বসতি, মন্দির আর জলাশয়? শিল্পীর কল্পনায়। সূত্র: সাজিদ
বিন দোজা ও ফারহানা নাজিম চৌধুরীর চিত্র অবলম্বনে রূপান্তরিত।]



বর্তমান ভারতের উড়িষ্যার ভূবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর মন্দির। কলিঙ্গারীতির মন্দির স্থাপত্যের আদর্শ উদাহরণ

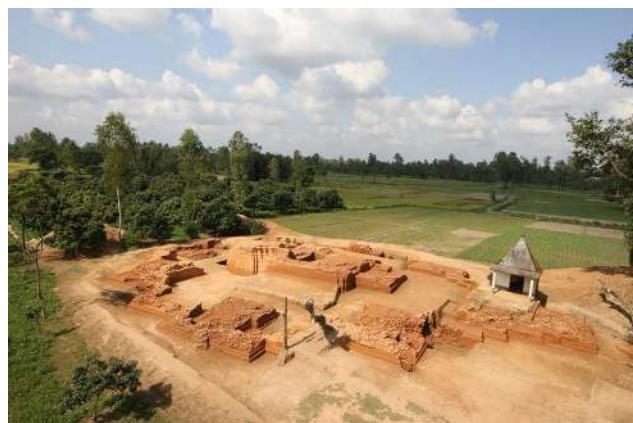


চীনের বিভিন্ন সূত্রে আঁকা জুয়ান-জ্যাংয়ের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। পরিবাজক জুয়ান-জ্যাংয়ের তেমনই একটি প্রতিকৃতি।



বাংলাদেশের দিনাজপুরের কাহারোলে খুঁজে পাওয়া নব-রথ হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এই মন্দির আর বিরলের হিন্দু মন্দিরটির উপরের কাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে

এর আগে উড়িষ্যার ভূবনেশ্বরের যে-মুক্তেশ্বর মন্দির তোমরা দেখেছ, এই মন্দির দুটোর উপরের কাঠামো (যাকে শিখর বলা হয়) তেমনই ছিল। ফারাক হলো, মুক্তেশ্বর মন্দিরের শিখর পাথরের তৈরি। এই মন্দিরগুলোর শিখর ইটের তৈরি ছিল।



বাংলাদেশের দিনাজপুরের বিরলে খননে খুঁজে পাওয়া বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

বাংলাদেশের নওগাঁর পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার, জগন্দল মহাবিহার, দিনাজপুরের সীতাকোট বিহার, কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতির শালবন বিহার, বিক্রমপুরের বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহারসহ ভারতের পশ্চিম বাংলার জগজ্জীবনপুরের নন্দদিহীকা মহাবিহার, বিহারের আনতিচকের বিক্রমশীলা মহাবিহার, নালন্দা মহাবিহারসহ অনেক সংজ্ঞা বা সংজ্ঞারাম প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় অসংখ্য মন্দিরও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিকশিত হয়। বেশ কিছু মাটি বা মাটি-ইটের প্রাচীর ঘেরা দুর্গ বা বসতিও গড়ে ওঠে। যেমন: পঞ্চগড়ের ভিতরগড়।



বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক রাষ্ট্র ও রাজত্ব তৈরি হওয়ার সময়ে বিভিন্ন শাসকবংশের নাম ও রাষ্ট্রের অবস্থান।

[উপনিদর সিংয়ের বইয়ের মানচিত্র থেকে রূপান্তরিত।]

ত্রিপাক্ষীয় রাজ্যসীমা ও অন্যান্য রাজ্যবৎশ
সাধারণ ৭৫০-৯০০ শতক



পাল, গুর্জর-প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকুটদের শাসনাধীনে তিনটি প্রধান রাষ্ট্র বিকশিত হয়েছিল ভারত উপমহাদেশে।



অষ্টসহস্রিকা প্রজাপারমিতা গ্রন্থ। পাল যুগে লিখিত। বাংলাদেশসহ ভারত উপমহাদেশের পূর্বাংশে বিভিন্ন বৌদ্ধবিহার ও মহাবিহারে এ ধরনের গ্রন্থ লিখিত ও চিত্রিত হতো।



পাল শাসনামলে তালপাতায় লিখিত ও চিত্রিত বৌদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের চিত্র ও লেখা।



ଆଲଚିର ଗୁହାଚିତ୍ରେ ଚିତ୍ରିତ ବୌଦ୍ଧ ଦେସୀ ତାରାର ଚିତ୍ର।



ଆଲଚିର ଗୁହାଚିତ୍ରେ ଘୋଡ଼ସମ୍ମାରେର ଛବି। ଆଲଚିର ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଲୋର ସଙ୍ଗେ ପାଲ ଆମଲେର ଚିତ୍ରରୀତିର ମିଳ ଆଛେ ବଲେ ଇତିହାସବିଦଗଣ ଧାରଣା କରେନ।



ভারতের বিহারে অবস্থিত নালন্দা মহাবিহারের বিহার ও মন্দিরগুলোর ছবি।



ভারতের বিহারের আন্তিচকে অবস্থিত বিক্রমশীলা মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ছবি।



বাংলাদেশের নওগাঁয় অবস্থিত সোমপুর মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরসহ ছবি।



সোমপুর মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দির দেখতে এমন ছিল বলে মনে করেন ইতিহাসবিদগণ



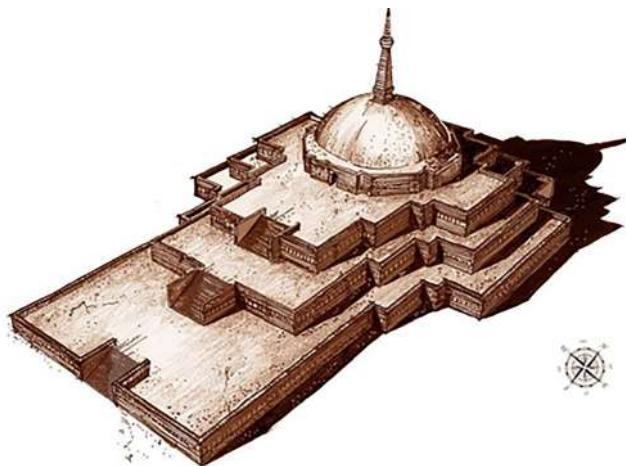
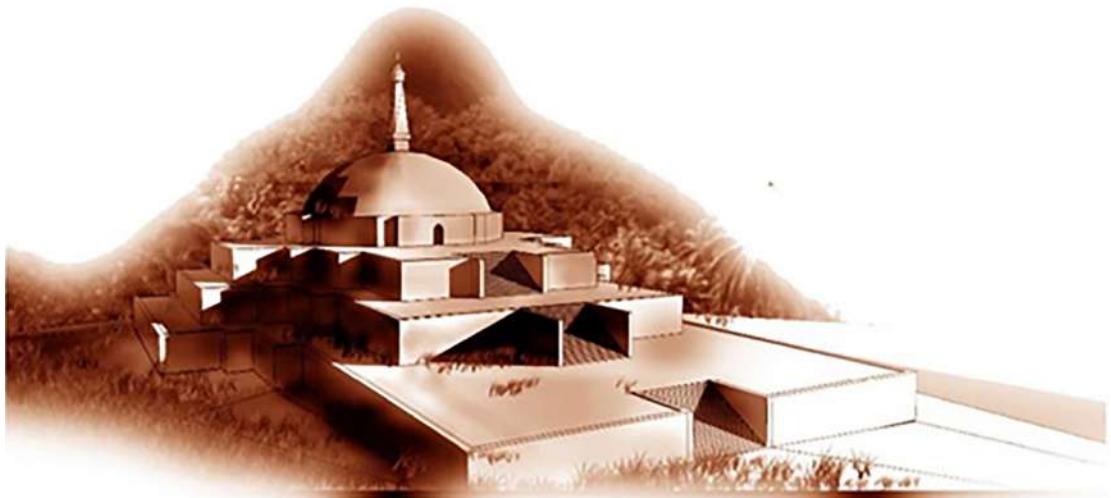
কুমিল্লার ভোজ বিহার খননে আবিষ্কৃত দক্ষিণ এশিয়ার
সবচেয়ে বড় ব্রোঞ্জের তৈরি বজ্রসন্দৰ্প প্রতিমা। এখন
লালমাই-ময়নামতির প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে প্রদর্শন করা
হচ্ছে।



পাথরের খোদাই করা বিষ্ণু প্রতিমা।



মহাস্থানগড়ের বাইরের নগরের বসতির কাল্পনিক চিত্র। সূত্র: সাজিদ বিন দোজা ও ফারহানা নাজিম চৌধুরীর চিত্র
অবলম্বনে রূপান্তরিত।]



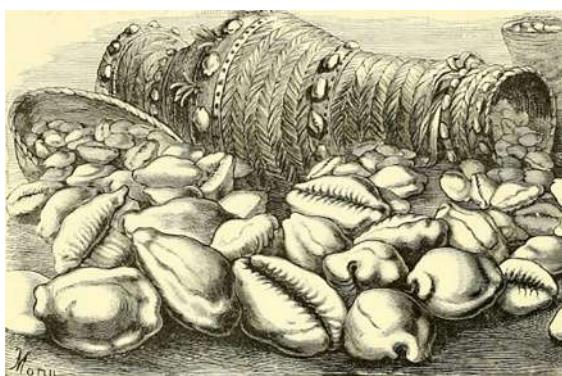
বাংলাদেশের মহাস্থানের পুড়নগর বা
মহাস্থানগড় সংলগ্ন গোকুল মেধের
ঋংসাবশেষের উপর থেকে নেওয়া চিত্র।
চারদিকে খোপ খোপ বানিয়ে একটি
স্থানকে উঁচু করে তার উপরের মন্দির
তৈরি করা হয়েছিল এখানে। বাংলা
অঞ্চলে এই স্থাপত্য তৈরির কৌশল
অনুসরণ করা হয়েছে অনেক স্থানে। এই
মন্দির দেখতে কেমন ছিল? পরে ছবিতে
তোমরা ধারণা করতে পারবে।

গোকুল মেধ দেখতে কেমন ছিল? সাজিদ বিন দোজা ও
ফারহানা নাজিম চৌধুরীর ধারণা অনুসারে এমনই ছিল গোকুল
মেধের মন্দিরের চেহারা।



কড়ি:

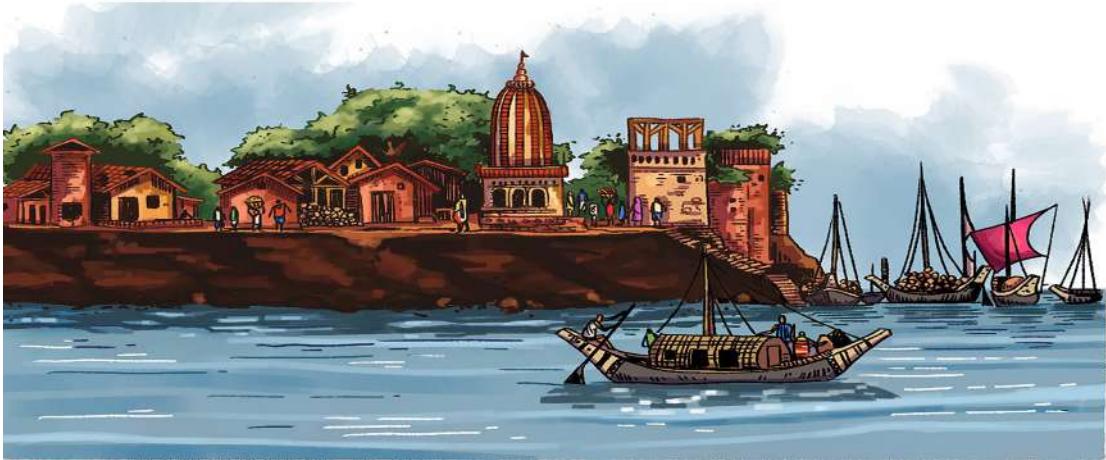
পুরো কড়ি আর একদিকে কাটা কড়ি। এই কড়িই আনু, ১৬শ-১৭শ শতক পর্যন্ত মুদ্রা বা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বাংলা অঞ্চলে চালু ছিল। আঞ্চলিক বিভিন্ন রাজত বিভাগের সময়ে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাংশে ও দক্ষিণাংশে এই কড়ি ছিল অন্যতম মুদ্রা। তখন ধাতব মুদ্রা চালু ছিল দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বাংশে সমতট ও হরিকেল অঞ্চলে কড়ির পাশাপাশি। তোমাদের এখন শুনে অবাক লাগতে পারে। এখনো আমাদের ভাষায় কড়ির একসময়কার এই গুরুত্ব আর টাকা হিসেবে এর ব্যবহারের ইঙ্গিত পাবে। তোমরা হয়তো পড়বে, ‘কপর্দিকহীন’ (মানে, সর্বস্বান্ত, নিঃস্ব)। এই কপর্দিক শব্দের অর্থ কিন্তু কড়ি। আবার পড়বে ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’ কিংবা ‘কানা কড়িরও দাম নাই’। এসব শব্দ বা বাগধারা এখনো আমাদের বাংলা ভাষায় টিকে আছে। যদিও কড়ি আর আমরা টাকা হিসেবে বা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করি না। কিন্তু প্রতীকীভাবে এখনো কড়িকে ধন-সম্পদ, বা টাকা-কড়ি হিসেবে অনেকেই বিবেচনা করেন। কড়ি যদি ফুটা বা ভাঙা হয় সেই কড়ির কোনো মূল্য বা দাম নেই। ওই সময়ের লিখিত বিভিন্ন উৎসে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে আরও নানা মানদণ্ডের নাম পাওয়া যায়। তবে সেগুলোর কোনোটাই বস্তুগতভাবে পাওয়া যায় নাই। তোমরা আরো বিস্মিত হবে জানলে। এসব কড়ি সমুদ্রের শামুকের একটি প্রজাতি। আর পাওয়া যায় একমাত্র মালদ্বীপে। তখন বাংলা থেকে মালদ্বীপে চাল রপ্তানী করা হতো। আর কড়ি আমদানি করা হতো। বাংলায় এই কড়ি কেবল মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃতই হতো না। বাংলা থেকে কড়ি রপ্তানি করা হতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আর ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকার নানা অঞ্চলে। তখন কড়ির দাম আসলেই অনেক ছিল।



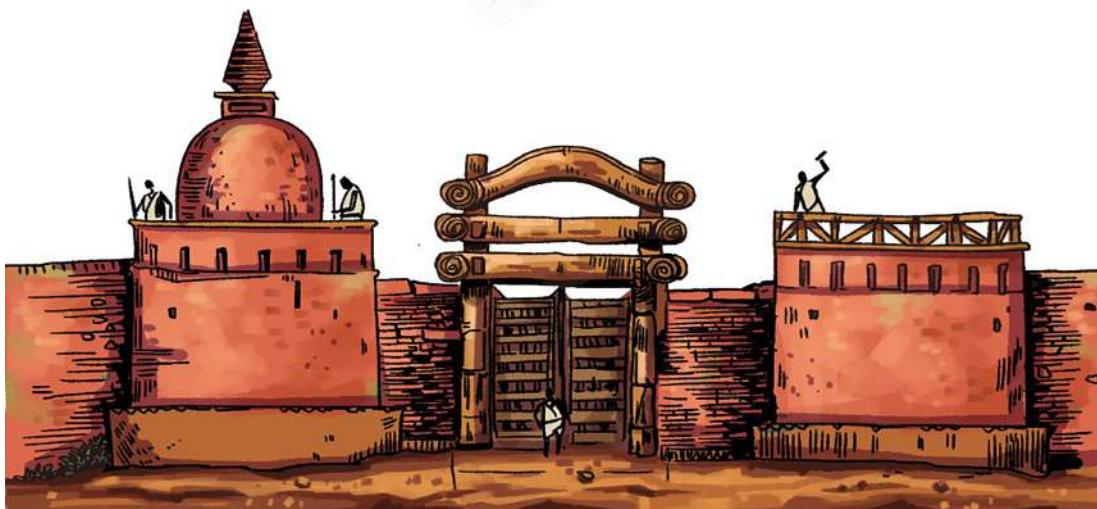


সে-সময়ের অনেক নগরকেন্দ্রই বড় প্রাচীর বা দেয়াল দিয়ে ঘিরে সুরক্ষিত করা হতো। শুরুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার পাশাপাশি নগরে বসবাস করা অভিজাত শ্রেণির মানুষজন নগরের বাইরের মানুষজনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতেন। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়াও একটা কারণ ছিল। ভারত উপমহাদেশের অনেক নগর কেন্দ্রের চারপাশের এই প্রাচীর বা উচু দেয়াল পাথর দিয়ে বানানো হতো। অনেক সময় একাধিক প্রাচীর থাকতো। মাটির তৈরি, ইটের তৈরি আর ইট ও মাটির তৈরি। বাংলাদেশে বেশির ভাগ প্রাচীরই হয় মাটির, নয়তো ইটের তৈরি ছিল। বিভিন্ন সময়ে এই প্রাচীরগুলো ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে গেছে। প্রাচীরের পুরোটা বা আংশিক, উপরের দিকে বেশ প্রশস্ত হতো। প্রাচীরের বাইরের দিকে থাকতো গোলাকার বুরুজ। এই বুরুজের উপরে রক্ষীরা থাকতো। প্রশস্ত অংশ দিয়ে রক্ষীরা আসা যাওয়া করত। এসব বুরুজ দাঁড়িয়ে দূরের জিনিস যেমন দেখা যেতো, তেমনই কেউ হামলা করলে এই বুরুজের উপরের রক্ষীরা তাদের হামলা ঠেকানোর চেষ্টা করত। তীর-ধনুক, বর্ণা, বা অন্য কোনো অস্ত্র ব্যবহার করে। পরে মধ্যযুগে এ ধরনের দুর্গের প্রাচীরের উপরে কামান বসানো থাকত। মহাস্থানগড় বা পুড়নগরের করতোয়া নদীসংলগ্ন দিকের এই প্রাচীরের ছবিটি কল্পনা করে একেছেন স্থপতিগণ। [সূত্র: সাজিদ বিন দোজা ও ফারহানা নাজিম চৌধুরীর চিত্র অবলম্বনে বৃপ্তান্তরিত।]

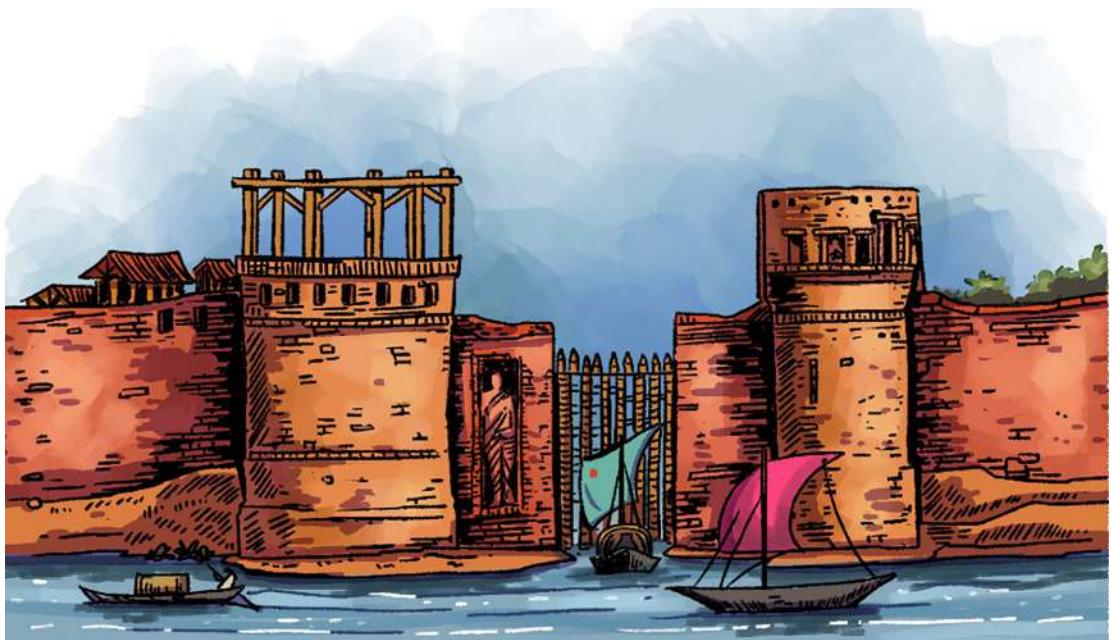




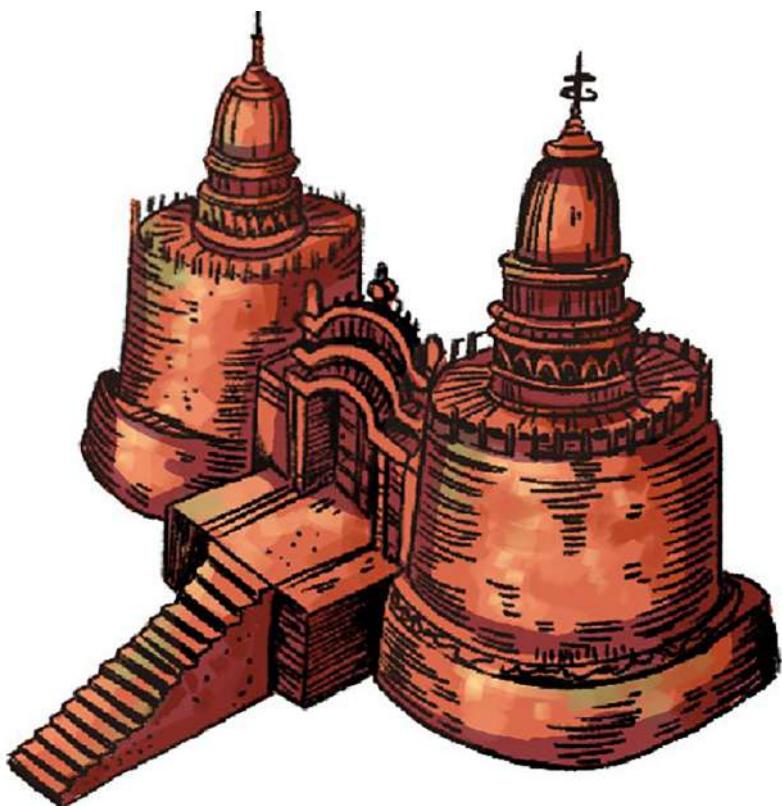
মহাস্থানগড় ও করতোয়া নদীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ছিল। পুড়নগর গড়ে উঠেছিল করতোয়া নদীকে কেন্দ্র করে। নদীটি ছাড়া এই নগরকেন্দ্রটি বিকশিত হত না। টিকে থাকতে পারতো না। তোমরা এই নগরকেন্দ্রের সঙ্গে করতোয়া নদীর সম্পর্ক কেন এত ঘনিষ্ঠ ছিল বলতে পারবে? এখনো বাংলাদেশে বেশিরভাগ শহর-গঞ্জ-হাট নদীর তীরের অবস্থিত। নদীগুলোর অনেকগুলোই আর আগের মতন পানি বহন করে না। অথবা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু পুরানো হাট-বাজার-গঞ্জ-শহর এখনো নদীর তীরেই রয়েছে। নদী যখন তার প্রবাহপথ পাল্টেছে বা এক খাত থেকে অন্য খাতে সরে গেছে বসতিগুলোও স্থানান্তরিত হয়েছে। এখন রাস্তার মাধ্যমে হয়ত যোগাযোগ ও পরিবহন সহজ হয়েছে। কিন্তু আগে যখন নদীগুলোতে সারাবছর পানি থাকত তখন নদীগুলোই ছিল চাষাবাদ, যোগাযোগ, বাণিজ্যের প্রধান পথ। অনেকটা আমাদের শরীরের রক্তনালীর মধ্যের রক্তপ্রবাহ যেমন আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, নদী ও তার মধ্যের বৃষ্টির পানিপ্রবাহ বাংলাদেশের মানুষ, জমি ও যোগাযোগকে হাজার হাজার বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। নদীকেন্দ্রিকতা আর নদীর উপরে নির্ভরশীলতা ছাড়া বাংলাদেশে মানুষের বসতি গড়ে ওঠা আগেও সম্ভব ছিল না। এখনও কঠিন। [ছবিটি কল্পনা করে আঁকা। সূত্র: সাজিদ বিন দোজার চিত্রের রূপান্তরিত রূপ]



পুড়নগরের চারপাশের প্রাচীর এখন ভেঙ্গে গেছে। সেই সময়ের প্রবেশদ্বারগুলোর নিচের ভাঙ্গা অংশ আমরা খুজে পাই। কিন্তু তখন প্রবেশদ্বারগুলো দেখতে কেমন ছিল? তোমরা উপরের ছবি দুটো দেখে ধারণা করতে পারবে। [সূত্র: সাজিদ বিন দোজার চিত্র থেকে রূপান্তরিত]

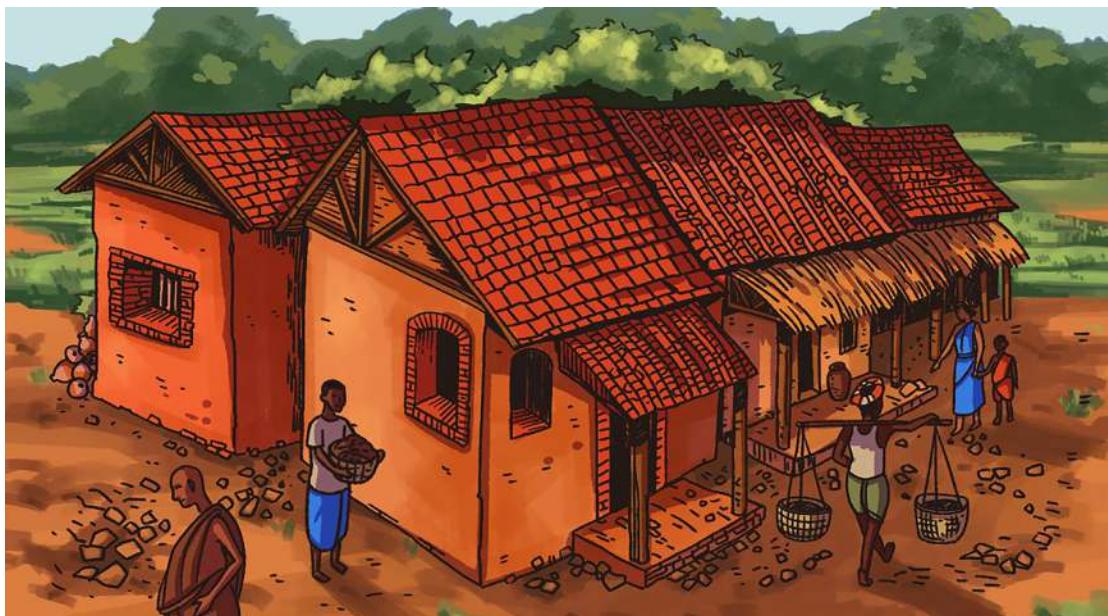


করতোয়া নদী হয়েও নৌযানের নগরে প্রবেশের দরজা ছিল পুড়নগরে। সেই প্রবেশ দরজার কল্পিত চিত্র।
সাজিদ বিন দোজার চিত্র থেকে রূপান্বিত।

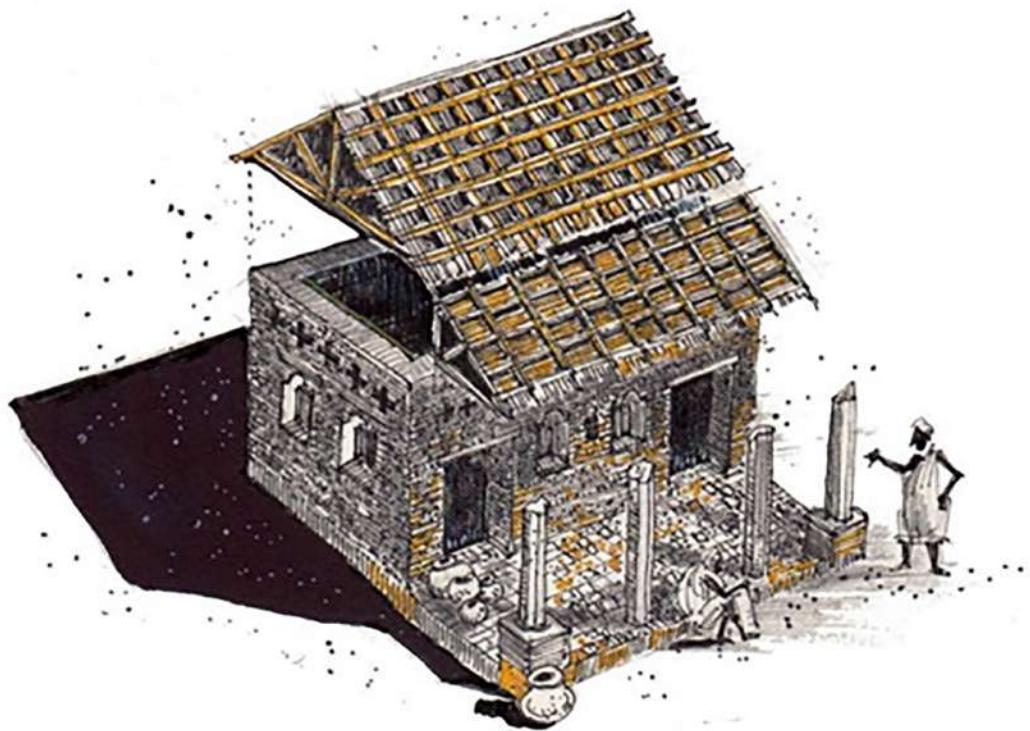




মহাস্থানের নগরের বাইরের সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ও বসতি কেমন ছিল? [সূত্র: সাজিদ বিন দোজার কল্পিত চিত্রের রূপান্তর]



মহাস্থানের সাধারণ মানুষ কেমন ঘরবাড়িতে থাকতেন? [সাজিদ বিন দোজার কল্পনার রূপান্তরিত চিত্ররূপ।]



পুড়নগরের মানুষজন কেমন বাড়িতে থাকতেন? [সাজিদ বিন দোজার কাল্পনিক চিত্র]

আমরা এ পর্যন্ত অনেকগুলো প্রাচীন স্থাপনার ছবি ও মডেল দেখলাম। এ অধ্যায়ে পরেও আমরা এরকম অনেক প্রাচীন স্থানের ছবি দেখতে পাব। তোমার আশপাশে বা কাছাকাছি এ রকম যেকোনো একটি স্থাপনা/ প্রাচীন স্থান মা, বাবা, শিক্ষক বা বড়দের সহায়তায় দেখে আসবে এবং সেটি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তোমার ভ্রমণ ডায়েরিতে লিখবে।



রানির বাংলো প্রাচীন স্থানের মন্দির



শালবন বিহার



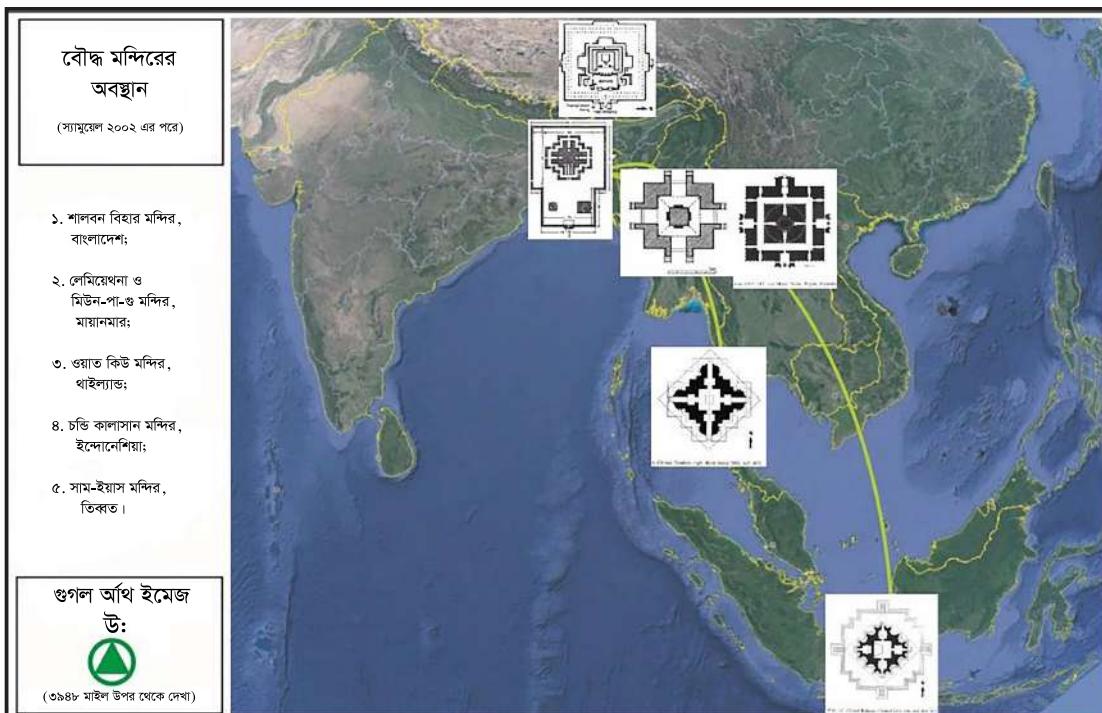
লেখকোট বিহার



রূপবান মুড়া



চারপত্র মুড়া



বাংলা অঞ্চলের বৌদ্ধ মন্দির স্থাপত্যরীতি দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির স্থাপত্যরীতিকে প্রভাবিত করেছিল। লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলের শালবন বিহার, আনন্দ বিহারসহ বেশ কয়েকটি বৌদ্ধমন্দিরের গঠন ও আকার বিভিন্ন অঞ্চলের স্থাপত্যর গঠন ও আকার দেওয়ায় বড় ভূমিকা রেখেছিল। এই মানচিত্রে তেমনই কয়েকটি স্থান ও মন্দিরের ছবি ও অবস্থান দেখানো হয়েছে।



বাগান, মিয়ানমার



পুঁ মিয়ানমার



জাভা, ইন্দোনেশিয়া



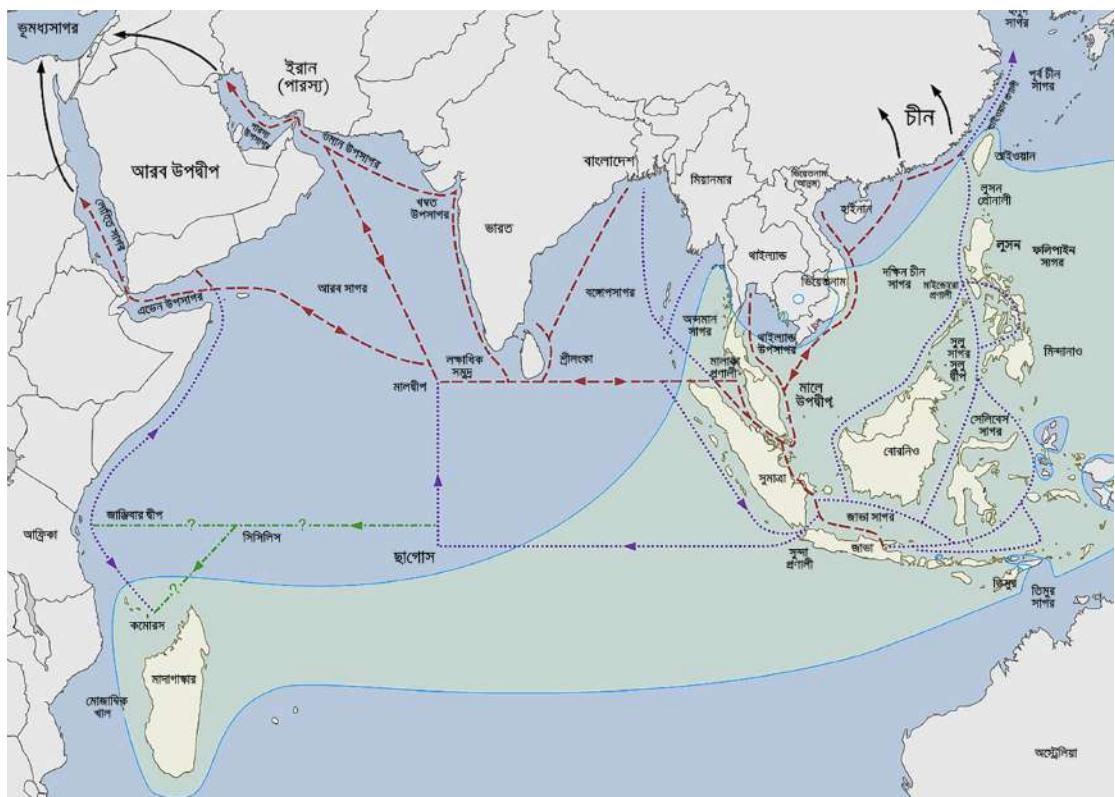
থাইল্যান্ড



তিক্সে বৌদ্ধমন্দির



হরিকেল মুদ্রা (বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রচলিত মুদ্রা) আর আরাকানে প্রচলিত মুদ্রার মধ্যে চিত্রের সাদৃশ্য। এই অঞ্চলে কড়ির পাশাপাশি ধাতব মুদ্রাও প্রচলিত ছিল।



ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর এবং চীন সাগরসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগের পথ ও বিস্তৃতি।

এই সময়েই ভারত উপমহাদেশ জুড়ে নতুন নতুন অনেক নগরকেন্দ্র গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় নগরায়ণের সময় তৈরি হওয়া অনেক নগর-কেন্দ্র ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র তাদের গুরুত্ব হারায়। কিছু কিছু নগরের গুরুত্ব বেড়ে যায়। আবার নতুন নতুন নগর ও শহর, নতুন ব্যবসা ও বাণিজ্যকেন্দ্র তৈরি হয়। বাংলা অঞ্চলের ক্ষেত্রে বসতি ও নগর বিকাশের ক্ষেত্রে নদীব্যবস্থা খুব বড় প্রভাব ফেলেছিল। মহাস্থানগড় বা প্রাচীন পুরুনগর বিকশিত হয়েছিল করতোয়া নদীর তীরে, বানগড় বা কোটিবর্ষ বিকশিত হয়েছিল পুনর্ভবা নদীর তীরে। ভিতরগড় বা ধর্মপাল রাজারগড়সহ প্রাচীরঘেরা বিভিন্ন বসতি বিকশিত হয়েছিল নদীর তীরে। নতুন নগর বিকশিত হওয়ার অর্থ হলো কৃষির প্রসার ও কৃষিজাত পণ্য অতিরিক্ত থাকার কারণে নগরের বিভিন্ন পেশার মানুষজন যারা চাষাবাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না তাদের খাওয়াদাওয়াসহ বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হওয়া। বড় বড় স্থাপনা, ধর্মীয় স্থাপত্যসহ নানা বসতি নির্মাণের জন্য কারিগর শ্রেণি, স্থপতি, কর্মকার, মারি, চর্মকার, তাঁতিসহ নানা পণ্য উৎপাদনকারী, সামন্তশ্রেণির প্রতিনিধিদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কৃষিজ পণ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল।



চর্যাপদের তালপাতার পান্তুলিপি

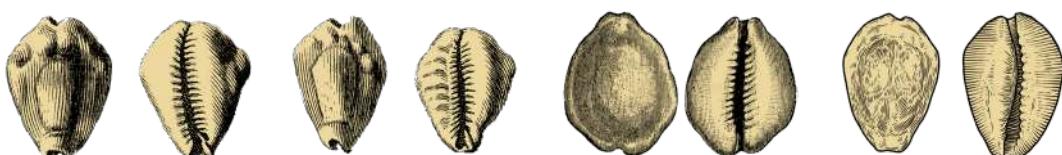
চর্যাপদ অনেকজনের লেখা পদ বা কবিতার একটি সংগ্রহ। এই সংগ্রহের পান্তুলিপিটি খুঁজে পান পদ্ধিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তৎকালীন সহজীয়া বৌদ্ধ পথের অনুসারীদের লিখিত এই পদগুলো যে ভাষায় লিখিত হয়েছিল সেই ভাষা থেকেই বাংলাসহ অসমীয়া, উড়িয়া ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। কবিতাগুলোর ভাষায় সহজীয়া পদলেখকগণ সরাসরি বিভিন্ন প্রসঙ্গ না বলে রহস্যময় ভঙ্গিতে বলেছেন। সে জন্য এই ভাষাকে সান্ধ্যভাষা বলা হয়। তবে এই পদ বা কবিতাগুলো সাধারণ ৮ম শতক থেকে সাধারণ ১২শ শতকের মধ্যে লেখা। ওই সময়ের বাংলাসহ ভারত উপমহাদেশের পূর্বাংশের সমাজ, জীবনসহ নানা বিষয় সম্পর্কে এই পদগুলো থেকে ধারণা পাওয়া যায়। মানুষের দারিদ্র্য, উঁচু-নীচু ভেদাভেদ, বৈষম্য আর সহজ বিভিন্ন পথে সাধনার মধ্য দিয়ে ধর্মাচারণের নানা উদাহরণ এই পদগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধবিহার ও মহাবিহারগুলো আর মন্দিরগুলোকে অনেক জমি দান করা শুরু হয়েছিল। এই জমিতে উৎপন্ন কৃষিজগ্য মহাবিহারে বা বিহারে বসবাসকারী বৌদ্ধ বা অন্যান্য সংসারত্যাগী সাধকদের খাওয়া-দাওয়া, দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল। গ্রামাঞ্চলে হাট, বাজার আর ব্যবসায়ীদের সংগঠন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ব্যবসা ও বাণিজ্য স্থানীয় পর্যায় থেকে আন্তঃদেশীয় পর্যায়ে প্রসারিত হয়েছিল। নদী ও স্থলপথে পণ্য আনা-নেওয়া ও ব্যবসার পাশাপাশি অনেক পণ্য উপকূলে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের জন্য পাঠানো হতো।

স্থাপত্য ও শিল্পকলায় এতসব অর্জনের পরেও একটা কথা ভুললে চলবে না যে, সাধারণ মানুষের জীবন তখনও দারিদ্র্য ও কঠে কাটতো। নানা ধরনের লিখিত সূত্র আর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে ইতিহাসবিদগণ দেখিয়েছেন যে, সাধারণ কৃষক, কারিগর, তাঁতি, জেলেসহ নানা পেশার মানুষজনের জীবন বেশ কঠিন ছিল। শাসক, সামন্ত, জমির মালিক সম্পন্ন কৃষক, আর জাতি বর্ণ প্রথার বৈষম্যের কারণে সমাজের বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবন দারিদ্র্য ও কঠে কাটতো। যে কারিগরগণ এসব বড় বড় স্থাপত্য তৈরি করেছিলেন, তারা যে খুব আরাম-আয়েশে ছিলেন না সেটা স্পষ্ট। যে কারিগরগণ পাথর খোদাই করে ভাস্কর্য তৈরি করতেন তাদের সামাজিক মর্যাদা খুব উপরে ছিল না।

চলো আমরা আমাদের কাছাকাছি যেকোনো একটি কারিগর শ্রেণি যেমন- কামার, কুমার, স্থপতি, কর্মকার, মাঝি, চর্মকার, তাঁতি, চাষি এদের কাছে যাই। তাদের করা কাজ সম্পর্কে জানি এবং তাদের কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ছবি এঁকে বা লিখে একটা প্রতিবেদন তৈরি করি।

এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্য বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রা হিসেবে ধাতব মুদ্রা এবং কড়ির প্রচলন ছিল। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কড়ির পাশাপাশি ধাতব মুদ্রা ব্যবহৃত হতো। অন্যদিকে, বরেন্দ্র ও বঙ্গ অঞ্চলে কড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের উপকূলীয় বন্দরগুলো থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া থেকে চীনের ইউনান পর্যন্ত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ভারতের পূর্ব উপকূলের নানা বন্দরের সঙ্গেও সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলতো।



বাংলা অঞ্চল থেকে কাপড়, কাঠ, সুগন্ধি, চাল, লবণসহ নানা ধরনের পণ্য বাইরে পাঠানো হতো। মৌর্য আমল থেকেই বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা হয়ে নানা ধরনের পণ্য বর্তমান ভারতের পূর্ব উপকূলীয় ও পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলো থেকে বর্তমান ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, আফ্রিকা ও ইউরোপে পাঠানো হতো। অন্যদিকে, বাইরে থেকেও মসলার মতন নানা ধরনের পণ্য বাংলা অঞ্চলের বন্দরগুলো হয়ে স্থলপথে ও জলপথে উভর ভারত এবং পূর্ব ভারতের নানা অঞ্চলে যেতো। ইউরোপে ও এশিয়ার নানা অঞ্চলে যেতো। যে কড়ি মুদ্রা হিসেবে বাংলায় জনপ্রিয় ছিল সেই কড়ির বেশির ভাগই আনা হতো বর্তমান মালদ্বীপ থেকে। মালদ্বীপে পাঠানো হতো চাল। বক্ষোপসাগর আর ভারত মহাসাগর হয়ে এই সামুদ্রিক বাণিজ্য আর হিমালয় পর্বতের পাদদেশ হয়ে রেশম পথ হয়ে স্থল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা ও বর্তমান ভারতের আসাম, ভুটান, নেপাল আর তিব্বতের মাধ্যমে এই বিশাল বাণিজ্যিক পথ নানা জায়গায় বিস্তৃত ছিল। তোমরা শুনলে অবাক হবে— এ সময়ে বাইরে রপ্তানি করা পণ্যের মধ্যে ছিল নারিকেল, সুপারি, লবণ, এমনকি গড়ারের শিং। কাপড়, চিনি, জাহাজসহ আরও নানা পণ্য ও প্রযুক্তি অনেক দূরে বাণিজ্যিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মজার ব্যপার কি জানো, এ অঞ্চলের সামুদ্রিক বাণিজ্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল বাংলাসহ ভারত উপমহাদেশের আর আরবীয় বণিকগণ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক ও এই অঞ্চলের বণিকদের বড় ভূমিকা ছিল। যেমন ছিল চীনসহ আরও নানা দেশের বণিকদের। আমরা যদি মনে করি জাহাজ, অ্যারোপ্লেন,



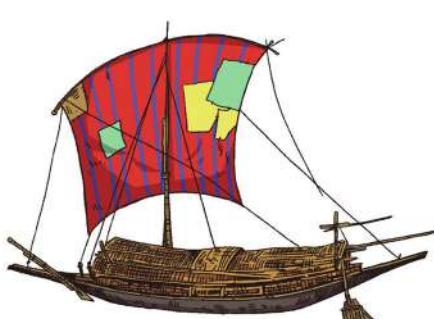
পালোয়ার



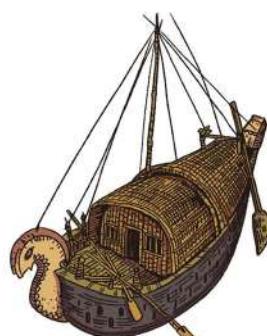
মগ নৌকা
(সুন্দরবনে প্রচলিত)



তামলুক
(লেবন পরিবহনে ব্যবহৃত)



বেন্দি-বাশরি
(যাতায়াত ও পরিবহন)



তেন্দি বালাম
(বাণিজ্য, পরিবহন,
নিজস্ব ব্যবহার)

বাংলার নদীনালা, খালবিলে, সমুদ্রে বিচরণ করত বিভিন্ন ধরনের নৌকা। সেসব নৌকার অনেকগুলোই এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষজন এখন ইঞ্জিনচালিত কয়েকটা ধরনের নৌকা ব্যবহার করেন মাত্র। সেসব নৌকার ইতিহাস জেনে আমরা মানুষের খাদ্যাভ্যাস, বাণিজ্যের ধরন, জলপথের প্রকার নিয়ে জানতে পারি। নদী ও জলের বাংলাদেশে নৌকা ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল সেই সময়। (সুত্র: স্থাপত্য.কম)

রেলপথের মাধ্যমে এখনই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশি হয়, তাহলে সেটা ভুল হবে। বাংলাসহ পূর্ব ভারতের কারিগরগণ সামুদ্রিক এই বাণিজ্যের জাহাজ ও নৌকা তৈরি করার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ইউরোপীয় বণিকগণ খুব কমই এই বাণিজ্য পথগুলোর নিয়ন্ত্রণ করতো।

ইউরোপের অনেক দেশের বাজারে বহু পণ্য যেতই এসব বাণিজ্যপথ হয়ে। বাংলার রেশম কাপড়ের চাহিদা ব্যাপক ছিল। বর্তমান ভারতের আসাম-মেঘালয় থেকে বনজ বিভিন্ন পণ্য ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী হয়ে নানা দিকে পাঠানো হতো।

এই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুব বড় ভূমিকা রেখেছিলেন সেই সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রচারক ও অনুসারী। ভারতের পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বাংলা ও বিহারে অবস্থিত বিভিন্ন বৌদ্ধ মহাবিহার/বিহারগুলোর চীন, তিব্বতসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে শিক্ষার জন্য ও বৌদ্ধ বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহ করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা আসতেন। ঠিক তেমনই এই অঞ্চল থেকে অনেকেই যেতেন তিব্বত, চীনসহ বিভিন্ন অঞ্চলে।

এদের এই যোগযোগের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগযোগের পথগুলোও খুলে যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক ও বণিকদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে। এমনকি এক শাসকের সঙ্গে আরেক শাসকের কূটনৈতিক যোগাযোগও ঘটে। চীন থেকে আসার সূত্রপাত ঘটেছিল আরও আগে। সেটা তোমরা জানো। এমন দুজন খুবই বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ ধর্মীয় পর্যটক ছিলেন জুয়ান-জ্যাং (হিউয়েন-সাং নামে পরিচিত) আর ই-জিং (যিনি ফা-হিয়েন নামে পরিচিত)। এসব বৌদ্ধ পণ্ডিতদের ভ্রমণকাহিনি ওই সময়ের

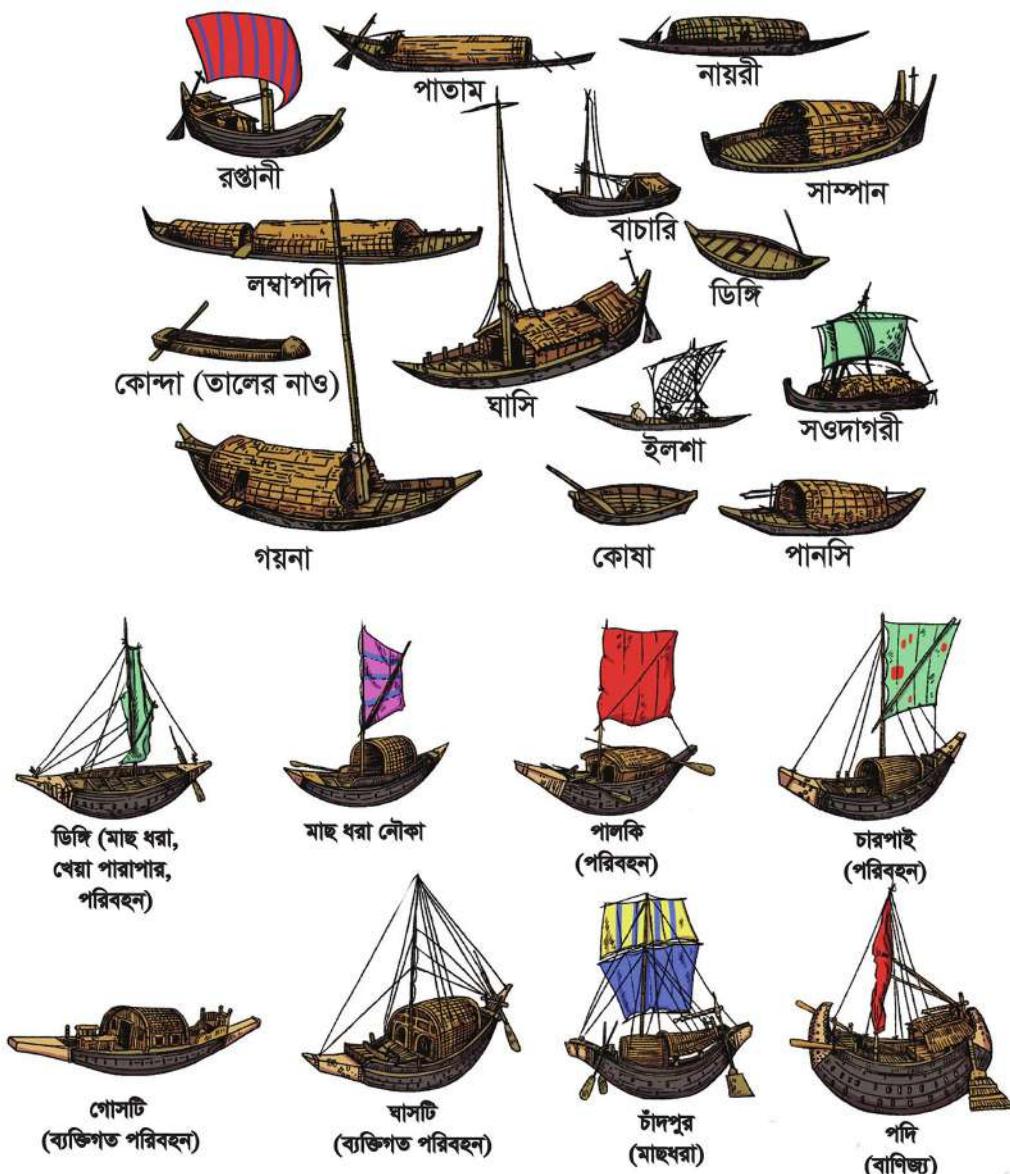


অজন্তার গুহাচ্ছে আঁকা সমুদ্রগামী জাহাজ



ইন্দোনেশিয়ার বরোবুদুর মন্দিরে খোদাই করা সামুদ্রিক বাণিজ্যের জাহাজ।

মানা স্থান, নগর, বসতি, নদী, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান করে। বিভিন্ন অঞ্চলের পরিচয় আর বিনিময়ের ধরন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আর সমাজের বৈশিষ্ট্যাবলি ও তাদের বিবরণী থেকে জানা যায়। অন্যদিকে, বাংলা ও সংলগ্ন অঞ্চল থেকে যে-সকল বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষক তিব্বতে গিয়েছিলেন শিক্ষা প্রদানের জন্য, তাদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর সর্বাগ্রে। আরও আছেন শান্তিরক্ষিত ও বিভূতিচন্দ্র। ভাষার ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ সহজীয়াদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাংলা ভাষায় লেখা সবচেয়ে পুরোনো যে পান্দুলিপি পাওয়া গেছে সেই চর্যাপদ প্রধানত সহজীয়া বৌদ্ধ সিন্ধাচার্যদের লেখা বিভিন্ন পদ বা কবিতা। সেই লেখাও এই সময়ের। ভাষাগত পরিচয়, নির্দিষ্ট আঞ্চলিক পরিচয়, আচার-আচরণ এবং জীবনযাপনের নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক ধরন এই সময়েই আকার পেতে শুরু করে।



আমরা তো দেখলাম নদী/ সমুদ্রপথ যেমন যোগাযোগে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে আবার নদী বা অন্যান্য স্বাদু পানির জলাশয় কৃষিকাজসহ আমাদের দৈনন্দিন কাজেও অনেক ভূমিকা রাখে। তোমার আশপাশেও নিচয় এমন জলাশয়/ নদী/ সমুদ্র আছে বা আগে ছিল। তুমি এসব জলাশয়/ নদী/ সমুদ্র সম্পর্কে বড়দের কাছ থেকে জেনে নাও, এসব জলাশয়/নদী/সমুদ্র থেকে আগে মানুষ কী কী উপকার পেতো বা এখন কী কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে সে বিষয়গুলো ছবি এঁকে বা লিখে ক্লাসের বন্ধুরা মিলে একটি দেয়ালিকা তৈরি করো।

সম্পর্ক, মিশ্রণ ও নতুন ধারণা : সুলতানি আমল ও বাংলা

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠের অংশ হিসেবে তোমরা নতুন নতুন অনেক কিছুই শিখছ। এসব শিখতে গিয়ে পুরোনো দিনের অনেক বিষয় এবং তথ্য জানতে পেরে নিশ্চয়ই অনেক অবাক-ও হচ্ছে! অবাক হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ বড় বড় শিক্ষাবিদ এবং জনী ব্যক্তি যারা ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন, তারাও ইতিহাস পড়তে গিয়ে, ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ঠিক তোমাদের মতোই অবাক হন। কেন অবাক হন জানো? কারণ, আমরা প্রত্যেকেই বাস করি নিজ নিজ সময়ে, বর্তমানে। আর বর্তমানে থেকে যখন অতীতের কোনো বিষয় নিয়ে পড়তে যাই তখন দেখা যায়, এখনকার অনেক কিছুর সাথেই অতীতের কোনো মিল নেই। একই বিষয় বা ধারণা অতীতে ছিল এক রকম আর পরবর্তী সময়ে হয়ে যায় অন্যরকম।



একটু গোলমেলে ঠেকছে, তাই না? একটা উদাহরণ দিয়ে বললেই খুব সহজে বুঝতে পারবে। তোমাদের যদি জিজ্ঞেস করি, ‘বিদেশ’ বলতে তোমরা কাদের বোঝাবে? তোমরা চোখ বন্ধ করে বলবে, বিদেশ হলো তারাই যারা আমাদের দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের বাইরে থেকে এই দেশে এসেছে। তোমাদের উত্তর একদম সঠিক। কিন্তু সুলতানি আমলে যদি কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো ‘বিদেশ’ কে? তাহলে সে কী বলত জানো? সে বলত, অপরিচিত কোনো ব্যক্তি যে আমাদের গ্রামে বা অঞ্চলে থাকে না, আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অংশ নয়, সেই বিদেশি। আবার ধরো, তোমাদের উত্তরে তোমরা বললে, বাংলাদেশের বাইরে থেকে যারা আসবে তারাই বিদেশি। এখন এই বাংলাদেশ বলতে তোমরা যে ভূখণ্ডকে বুঝছো, তা কি সবসময় একই রকম ছিল? না, একই রকম ছিল না। একেক সময়ে বাংলা অঞ্চল ছিল একেক রকম। সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক ও ভৌগলিক কারণে অঞ্চল বা দেশের সীমানাও পাল্টে যায়, বদলে যায় মানচিত্র। মানচিত্রের কথা যখন এলোই, চলো সুলতানি আমলের বাংলার একটি মানচিত্র দেখে আসি।

যিনি মানচিত্র তৈরী করেন তাকে মানচিত্রকার বা **Cartographer** বলা হয়

সময়ের সাথে সম্পর্ক, চিন্তারও বদল হয়। আর এই বদলে যাওয়াটা ভাষা, শব্দ, সংস্কৃতি, অভ্যেস, জীবন-যাপন থেকে শুরু করে সবকিছুর উপরই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু কথা হলো এই বদলে যাওয়ার সাথে আমাদের আজকের পাঠের সম্পর্ক কোথায়? বন্ধুরা, আমাদের আজকের পাঠের শিরোনাম ‘সম্পর্ক’, মিশণ ও নতুন ধারণা : সুলতানি আমল ও বাংলা’। পাঠের শিরোনাম পড়ে তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে ফেলেছ যে, সুলতানি আমলে বাংলা অঞ্চলে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক কেমন ছিল, একে অপরের সাথে বা এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের মানুষের সাথে কীভাবে মিশত এবং এই মিশতে গিয়ে কী কী নতুন ধারণা বা বিষয়ের সাথে পরিচিত এবং অভ্যন্তর হতো, সেসব নিয়েই আমরা আলোচনা করব। আর এই আলোচনার বড় অংশ জুড়েই থাকবে বদলে যাওয়া ইতিহাস, সংস্কৃতি, মিশণ এবং নতুন ধারণার উৎপত্তি। বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে চলো আমরা সুলতানি আমলের একটি মানচিত্র দেখে আসি। তবে শুরুতেই খুব সংক্ষেপে সুলতানি আমলের সময়কাল এবং এসময়ের সাধারণ কিছু তথ্য জানা থাকলে পরের আলোচনাগুলো করতে আমাদের সুবিধা হবে।

কোন সময়কে সুলতানি আমল বলা হয়?

বন্ধুরা ষষ্ঠি শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে তোমরা জেনেছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে পাল ও সেন আমলকে ইতিহাসের প্রাচীন যুগ বলে অভিহিত করা হয়। এই পাল এবং সেন রাজবংশ দ্বাদশ শতাব্দি পর্যন্ত শাসন করে। মূলত এর পরই উপমহাদেশে সুলতানি আমল শুরু হয়। সুলতানি শাসন দিয়েই আমাদের এই অঞ্চলের ইতিহাস মধ্যযুগে প্রবেশ করে। সুলতানরা ১২০৪ সাল থেকে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশ শাসন করেন। মোগল সাম্রাজ্যের উত্থানের মাধ্যমে উপমহাদেশে সুলতানি আমলের সমাপ্তি ঘটে। সুলতানি শাসনের প্রধান ব্যক্তিকে বলা হতো 'সুলতান'। রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা এই সুলতানের কাছেই থাকত। সুলতানি শাসনামলেই সর্বপ্রথম 'কেন্দ্রিভূত শাসনব্যবস্থা' চালু হয়।

সুলতানি আমলের সময়কাল

উত্থান ১২০৪ সালে

পতন ১৫২৬ সালে

কেন্দ্রিভূত শাসনব্যবস্থা

তোমাদের মনে নিশ্চয়ই এবার নতুন প্রশ্ন এসেছে যে, এই 'কেন্দ্রিভূত শাসনব্যবস্থা' জিনিসটা আবার কী? এটা খুব সহজ একটা বিষয়। এখন যেমন আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। এই দেশের সবকিছু শাসন করা হয় কেন্দ্র অর্থাৎ ঢাকা থেকে। ঢাকাতে একটি সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সরকারে একটি মন্ত্রীসভা আছে, আইন বিভাগ আছে, শাসন বিভাগ আছে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা আছে। এছাড়া আরও রয়েছে বিভিন্ন অঙ্গ এবং সংস্থা। এদের মাধ্যমেই এই কেন্দ্র অর্থাৎ ঢাকা থেকে পুরো দেশের আইন-শুঙ্খলা, প্রশাসন, বিচার-সহ সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ বা দেখাশোনা করা হয়। এটাই হলো কেন্দ্রিভূত শাসনব্যবস্থা। কিন্তু আগে কিন্তু এমন ছিল না। তখন একেকটি অঞ্চল শাসন করত একেকজন। তারা তাদের মতো করেই তাদের অঞ্চল শাসন করত। সুলতানি আমলেই সর্বপ্রথম অনেকগুলো অঞ্চল নিয়ে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়। আর সেই সাম্রাজ্য কেন্দ্র অর্থাৎ দলী থেকে শাসন করা হতো। এই জন্য সুলতানি আমলকে বলা হয় 'কেন্দ্রিভূত শাসনব্যবস্থা'-এর প্রথম প্রচলনকারী।

সুলতানি শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

তোমরা তো আগেই জেনেছে, সুলতানি আমলের আগে এই অঞ্চলে পাল ও সেন শাসকগণ শাসন করতেন। কিন্তু সুলতানরা ছিলেন মুসলিম। তাই নতুন শাসকগণ ক্ষমতায় এসে দেশের আইন-কানুন এবং বিচার ব্যবস্থা পুরোটা পাল্টে ফেললেন। এই আমলে শরীয়ত অনুসারে দেশ পরিচালিত হতো। কিন্তু শাসনব্যবস্থা মোটেও ধর্মতাত্ত্বিক ছিল না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যেহেতু অমুসলিম ছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই সবাই সবসময় সুলতানদের শাসন মেনে নিতে চাইত না। ফলে সুলতানগণ অমুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দলী সালতানাতের অমুসলমান প্রজাদেরকে সুলতানরা 'জিমি' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, সুলতানি শাসনামলে সকল অমুসলমান প্রজাদের জান-মাল, সম্পত্তি, সম্মান সবকিছু রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল প্রশাসনের।

সুলতানগণ ছিলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এখন মনে হতে পারে, ‘সার্বভৌম ক্ষমতা’ আবার কী? বন্ধুরা, সার্বভৌম ক্ষমতা হলো সর্বময় ক্ষমতা। যে ব্যক্তি এই ক্ষমতার অধিকারী তারা তাদের ক্ষমতার জন্য কারও কাছে জবাবদিহিতা করতে হয় না। তার ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়। তিনি যেমন চান, তেমনই হয়। তারা নিজেদের নামে মুদ্রা চালু করতেন। আর এই মুদ্রা চালু করাকেই সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। মুদ্রার কথা যখন চলেই এলো, তাহলে চলো এখন আমরা সুলতানি আমলে প্রচলিত কিছু মুদ্রার ছবি দেখে আসি।



১২৪৬-১২৬৬ সালে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদের সময়কালে প্রচলিত একটি মুদ্রার এপিট-ওপিট



১২৬৬-১২৮৭ সালে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবানের সময়কালে প্রচলিত একটি মুদ্রার এপিট-ওপিট



১২৯৬-১৩১৬ সালে সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খিলজির সময়কালে প্রচলিত একটি মুদ্রার এপিট-ওপিট



১৩২৫-১৩৫১ সালে সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলকের সময়কালে প্রচলিত একটি মুদ্রার এপিট-ওপিট

তোমাদের জন্য মজার কাজ

তোমাদের জন্য এবার থাকছে একটি মজার খেলা। তোমরা তোমাদের পরিবারের বড় সদস্য কিংবা আঞ্চলিক-স্বজনদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ কিংবা অন্য যেকোনো দেশে প্রচলিত কিছু মুদ্রা সংগ্রহ কর। মুদ্রাটির উপর একটি সাদা কাগজ রেখে এবার কাগজের উপর হাত দিয়ে হালকা করে চাপ দাও। তারপর একটি পেন্সিল দিয়ে কাগজের উপর আলতোভাবে ঘষতে থাকো। দেখবে কাগজের নিচে থাকা মুদ্রার ছাপ কাগজের উপর ভেসে উঠেছে। এভাবে মুদ্রাটির দুইপাশ পেন্সিলের সাহায্যে কাগজে ছাপ দিয়ে সেই ছাপের পাশে মুদ্রাগুলোর মান, গায়ে অঙ্কিত সাল এবং অন্যান্য তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিশক্তিকরকে দেখাও।

এক নজরে সুলতানি শাসনব্যবস্থা

- সকল ক্ষমতার উৎস সুলতান
- কেন্দ্রিয় শাসনব্যবস্থা
- শাসন পরিষদ কয়েকটি বিভাগ নিয়ে গঠিত
- প্রত্যেক শহরে বিচারকাজ পরিচালনা করতেন একজন কাজী
- রাষ্ট্রীয় প্রধান আয়ের উৎস ছিল ভূমিকর
- প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার প্রচলন

উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথম নারী শাসক

তোমরা হয়তো সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে অথবা নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পেরেছ যে, আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশে বেশ কয়েকজন নারী রাজনীতিবিদ দেশ শাসন করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ের এসব নারী রাজনীতিবিদগণের দেশ শাসনের বহু আগে সুলতানি আমল সর্বপ্রথম নারী শাসক পেয়েছিল। তাঁর নাম ছিল রাজিয়া সুলতানা। তিনি দিল্লী সালতানাতে আরোহণকারী প্রথম নারী সুলতান। পিতা সুলতান ইলতৃমিশ মারা যাওয়ার পর তাঁর কন্যা হিসেবে তিনি ১২৩৬ থেকে ১২৪০ সাল পর্যন্ত দিল্লী সালতানাতের দায়িত্ব পালন করেন। শাসক হিসেবে রাজিয়া সুলতানার সুনাম বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি সুলতানের পোশাক পরে দরবারে উপস্থিত হতেন। যুদ্ধাত্মক বিশেষ পারদশী সুলতানা রাজিয়া যুদ্ধের মাঠে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রাও প্রচলন করেন।



সুলতানা রাজিয়ার আমলে প্রচলিত দুটি মুদ্রার এপিট-ওপিট

ইতিহাসবিদ এবং তাদের উৎস অনুযায়ী তৎকালীন সমাজব্যবস্থা

তোমরা তো জানোই ইতিহাস নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন, গবেষণা করেন, তাদের ইতিহাসবিদ বলে। সে হিসেবে তোমরাও একেকজন খুদে ইতিহাসবিদ। একদিন তোমরাও নিশ্চয়ই বড় ইতিহাসবিদ হবে। বড় ইতিহাসবিদ হওয়া অনেক সাধনার ব্যাপার। কারণ বড় ইতিহাসবিদ হতে গেলে যে সময়ের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে চাইছেন সে সময়কাল এবং অনুসন্ধানের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে অতীত সম্পর্কে জানতে বিভিন্ন ধরণের উৎস ব্যবহার করেন। তোমরা সুলতানি আমলের ইতিহাস অধ্যয়নকালে ইতিহাসবিদদের ব্যবহৃত উৎসগুলি হতে নানাবিধ তথ্য জানতে পারবে। ইতিহাসবিদদের গবেষণা অনুযায়ী, এ সময়ে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীর মানুষ বসবাস করলেও মুসলমানগণ অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। আর এর কারণ কিন্তু একটু আগেই বলা হয়েছে। সেই কারণটা মনে আছে তো? আচ্ছা, কারণটা আরেকবার মনে করিয়ে দিছি। সুলতানি আমলের শাসকগণ সবাই ছিলেন মুসলিম এবং সে জন্যই মুসলিমরা অন্যদের থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। মুসলমান সমাজে মূলত দুইটি শ্রেণী ছিল। একভাগে ছিল বাইরে থেকে আসা অভিজাত সম্পদায় যাদের মধ্যে আফগান, ইরানি, তুরানি, আরব ও তুর্কি থেকে আগত লোকজন ছিল। এই বহিরাগত সম্পদায় নিজেদেরকে বিজেতা মনে করতেন এবং শেখ, সৈয়দ, গাজীসহ নানা পদবীতে পরিচিত করতেন। অন্যভাগে ছিল স্থানীয় ধর্মান্তরিত সাধারণ শ্রেণী। অভিজাত শ্রেণী নিজেদের আশরাফ ও অন্যদের আতরাফ মনে করতেন। আশরাফ ও আতরাফদের মধ্যে মেলামেশা, বিশেষাদী, দাওয়াতের আদানপ্রদান একেবারেই ছিল না। বর্তমানেও এ ধরনের বিভাজন আমরা দেখতে পাই। সমাজের 'দলিতদেরকে' অস্ত্রজ ও অপাংক্ত্যে মনে করা হয়।

কিন্তু আমরা জানি, সমাজের বর্তমান এ ধারণা তোমরাই একদিন ঠিক করবে। তোমরা কাউকে ছোট করে দেখবে না, কাউকে হেয় করবে না। পরিচয়, পেশা, শ্রেণি, শিক্ষা, কাজের ধরন, পোশাক, কথা বলা, ভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি কোনো কারণেই কাউকে আলাদা মনে করবে না। কারণ, একটা বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে, ভিন্নতা আছে বলেই আমাদের পৃথিবীটা এত সুন্দর। একবার ভেবে দেখো, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির ভিন্ন গাছ না থেকে যদি শুধু এক প্রকারের গাছ থাকত তবে কি পৃথিবী এখনকার মতো এত সুন্দর লাগত? তাই, ভিন্নতাকে, বৈচিত্র্যতাকে আমাদের সবসময় সমান চোখে নিজেদের মতো করেই দেখতে হবে। আমাদের আজকের সমাজে হয়তো তোমরা এর চর্চা পুরোপুরিভাবে পাচ্ছ না, কিন্তু আমরা জানি, তোমাদের হাত ধরেই বৈচিত্র্যতাকে বরণ করে নেয়ার সুন্দর সংস্কৃতি আমাদের দেশে চালু হবে।

তোমাদের জন্য মজার কাজ

বাংলাদেশে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর বাইরেও রয়েছে আরও জাতিগোষ্ঠী, যারা নিজ নিজ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে আমাদের এই দেশকে আরও সুন্দর আর বৈচিত্র্যময় করে তুলছে। এবার তোমরা ভেবে এমন ৫টি জাতিগোষ্ঠীর নাম এবং তাদের একটি উৎসবের নাম লেখ। তোমাদের সুবিধার জন্য একটি করে দেখানো হলো।

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় জাতিগোষ্ঠীর নাম	তাদের উৎসবের নাম
মারমা	সাংগ্রাই

বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচয় তো পেলে। কিন্তু তোমরা তো ইতোমধ্যে জেনেছো যে এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির পেছনে ভূমিরূপের বৈচিত্র্য একটা বড় ভূমিকা পালন করে। মানুষের জীবন-যাপন অনেকাংশেই প্রভাবিত হয়ে তার আশেপাশের প্রকৃতি বা ভূমিরূপের মাধ্যমে। চলো আমরা বাংলাদেশের ভূমিরূপের বৈচিত্র্যের সাথে পরিচিত হই।”

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

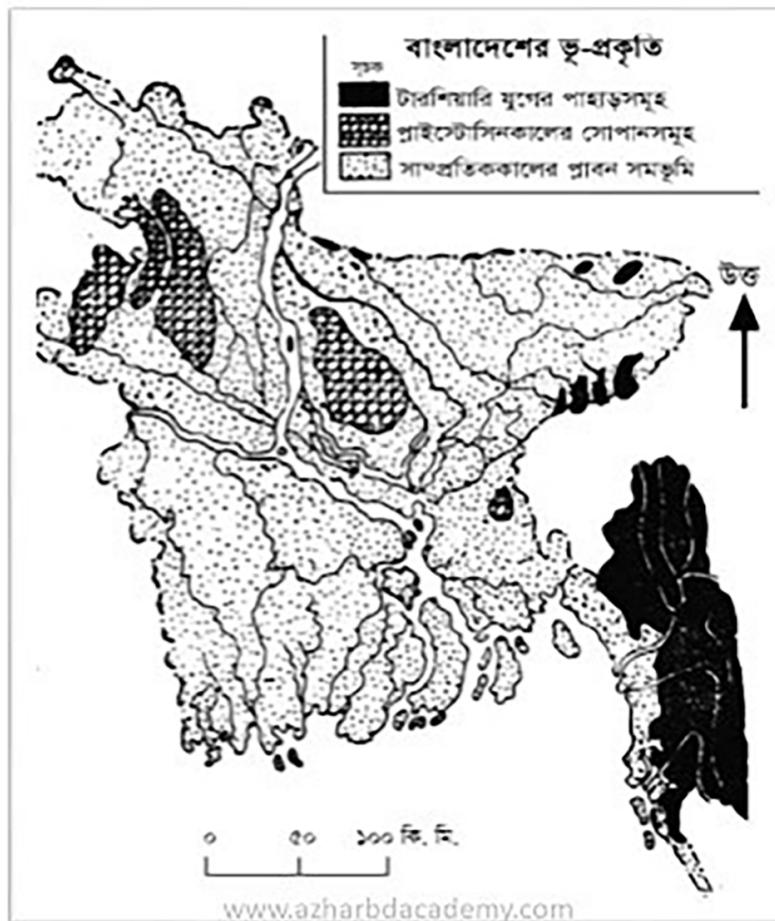
তোমরা তো জানো আমাদের বাংলাদেশ একটি ব-দ্বীপ। বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্বের কিছু অংশ ছাড়া পুরো বাংলাদেশই প্রধানত সমতল ভূমি। সময়ের সাথে বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরণের ভূমিরূপ।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি এসব ভূ-প্রকৃতিকে প্রধানত ৩ টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

২। প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ

৩। সাম্প্রতিক কালের প্রাবন সমভূমি



মানচিত্র

(১) টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ভূমিরূপ এই টারশিয়ারি যুগের পাহাড় গুলো। প্রায় ২০ লক্ষ বছর পূর্বে টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত সৃষ্টির সময় এই পাহাড় গুলো সৃষ্টি হয়েছিলো। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে টারশিয়ারি যুগের পাহাড় সমূহ দেখা যায়। দক্ষিণ-পূর্বে রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব দিকে এ ধরণের পাহাড় রয়েছে। পাহাড় গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিংডং (বিজয়) এর অবস্থানও এ অঞ্চলে। যার উচ্চতা ১২৩১ মিটার।

উত্তর-পূর্বে সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশে এবং মৌলভীবাজারের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ, হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণের পাহাড়গুলো এবং ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলার উত্তরাংশের পাহাড়গুলো এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা প্রায় ২৪৪ মিটার। উত্তরের পাহাড়গুলোকে স্থানীয়ভাবে টিলা বলে যাদের গড় উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ১২ ভাগ জুড়ে আছে এই টারশিয়ারি যুগের পাহাড় গুলো।

(২) প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ

আনুমানিক ২৫,০০০ বছর আগে উত্তর-পশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমি (রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। বরেন্দ্রভূমি প্লাইস্টোসিন যুগের সর্ববৃহৎ উচুভূমি) মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় (টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় মধুপুর এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড় অবস্থিত।) এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই এলাকায় এ অঞ্চল গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৮ ভাগ এলাকা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত।

(৩) সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

আমরা তো জানি বন্যার পানিতে প্রচুর পলি মাটি থাকে, আর বছরের পর বছর এই বন্যার পানির সঙ্গে আসা পলি মাটি জমে জমে প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ ভূমি সমভূমি। আর পলি মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে বলে এ ধরণের ভূমি খুবই উর্বর। ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, কুমিল্লা, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার পূর্বদিকে সামান্য অংশ, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলের অংশবিশেষ, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধিকাংশ এবং লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও হবিগঞ্জ জেলার কিছু অংশ জুড়ে এ সমভূমি বিস্তৃত। যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী ও ঢাকা অঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত সমভূমিকে ব-দ্বীপ সমভূমি বলে। নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলীয় সমভূমি। খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিছু অংশ নিয়ে স্রোতজ সমভূমি গঠিত।

তাহলে আমরা দেখলাম বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ এবং সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি গড়ে ওঠার সময়ও যেমন একই নয় আবার ভূমির গঠনেও রয়েছে বেশ কিছু পার্থক্য।

সুলতানি আমলে হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রথা অত্যন্ত কঠোর ছিল। তোমরা হয়তো জিজ্ঞেস করবে বর্ণভেদ প্রথা কী? হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বীগণদের মধ্যে ৪ ধরনের বর্ণ প্রচলিত ছিল। এগুলো হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সবার উপরে। তারা পৃজা-অর্চণা করতেন। ক্ষত্রীয়রা ছিল যোদ্ধা। বৈশ্যগণ কৃষিকাজ ও ব্যাবসা করে জীবিকা নির্বাহ করত। আর সমাজের সবচেয়ে নিচের অংশে অবস্থান করত শূদ্ররা। তারা কামার, কুমার, মুটে, দিনমজুর, মেঠের ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত ছিল। হিন্দু সমাজের বাকিদের কাছে শূদ্ররা ছিল অত্যন্ত নীচ। তারা সবার থেকে আলাদা থাকত। তাদের সাথে কেউ মিশত না। তৎকালীন হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। তোমরা যখন আরেকটু বড় হবে তখন জানতে পারবে, সুলতানি আমল ও মোগল আমল শেষ হবার পর ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলেও হিন্দু সমাজে এই ধরনের বর্ণভেদ প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই ব্রিটিশ উপনিবেশকালেই হিন্দুদের মধ্যকার কয়েকজন মহান ব্যক্তির চেষ্টায় সমাজ থেকে বর্ণভেদ প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। এই মহান ব্যক্তিদের মধ্যে কারও কারও নাম হয়তো তোমরা শুনেও থাকবে। এঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে একটু বড় ক্লাসে উঠলেই সমাজ পরিবর্তনে এই মহান ব্যক্তিদের অন্তুত সব গল্প তোমরা জানতে পারবে।

একনজরে হিন্দু সমাজের প্রথাসমূহ

বর্ণভেদ প্রথা : হিন্দু সমাজের ৪টি বর্ণের মধ্যে ভেদাভেদ প্রথা

বহুবিবাহ : একজন পুরুষের একাধিক বিয়ের প্রথা

বাল্যবিবাহ : তৎকালীন সময়ে মেয়ে শিশুদের বয়স ১২-এর আগেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া রীতি, বর্তমানে এ বয়সসীমা ১৮ বছর।

সতীদাহ : স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীকেও একই চিতার আগুনে সহমরনে যেতে বাধ্য করা

অমানবিক দাসপ্রথা

এখন যে কথাগুলো পড়তে যাচ্ছ, তা হয়তো পড়তে তোমাদের ভালো লাগবে না। কিন্তু ইতিহাস তো শুধু ভালো নিয়েই কাজ করে না, বরং মন্দকে জানার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য দিক-নির্দেশনা দেয়াও ইতিহাসের কাজ। তাই ইতিহাসের এই মন্দটুকুও তোমাদের জানতে হবে। সুলতানি আমলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। তোমরা হয়তো জানতে চাইতে পারো দাসপ্রথা কী? দাসপ্রথা হলো অমানবিক একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে মানুষের কেনা-বেচা হতো। এই ব্যবস্থায় ধনীরা ব্যক্তিকে কিনে নিত এবং ক্রীত ব্যক্তি তার সম্পত্তি হিসেবে যেকোনো কাজ করতে বাধ্য থাকত। সুলতানি আমলেও এই দাসপ্রথার মাধ্যমে মানুষের কেনা-বেচা হতো। দাসগণ অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করত। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। সুলতানি আমল ও মোগল আমল শেষে ব্রিটিশ উপনিবেশের মধ্যমভাগে আইন করে এই অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।

সুলতানি আমলে নারীর অবস্থা

নারীদের অবস্থা ও সম্মান অন্য সব সময়ে যেমন ছিল সুলতানি আমলেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তাদের অবস্থান পুরুষের অনেক নীচে থাকত। অধিকাংশক্ষেত্রেই নারীরা স্বামী কিংবা পুত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল। সন্তান ধারণ এবং গৃহস্থালী কাজের বাইরে তাদের অন্য কোনো কাজে সম্পত্তি সেই অর্থে ছিল না। সমাজের ধনী শ্রেণির নারীদের মধ্যে কেউ কেউ কাব্যচর্চা বা সাহিত্য চর্চা করার নজির অবশ্য সুলতানি আমলে পাওয়া যায়। তবে তার সংখ্যা কুবই সামান্য। নিম্নবর্গের সমাজে নারীরাও পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে মাঠেঘাটে কৃষিকাজ থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজ করত।

সুলতানি আমলের অর্থনৈতিক অবস্থা

দিল্লী সালতানাতের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সেই সময়ের কিছু লেখক যেমন মিনহাজ-ইস-সিরাজ, জিয়াউদ্দিন বারণি, শামস-ই-সিরাজের লেখা থেকে অনেক কিছুই জানা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা জানার জন্য সুলতানি আমলে বহিরাগত পর্যটকদের লেখা বিবরণী ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে পর্যটক আবার কারা?

পর্যটক কারা?

পর্যটক হলো তারাই যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সীমানা, সংস্কৃতি, মানুষ, ইতিহাস, জীবনযাপন, অভ্যেস, শিক্ষা ইত্যাদি জানার জন্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে বেড়ান। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ান। বেড়াতে বেড়াতে তারা বিভিন্ন জায়গার সমাজ-সংস্কৃতি দেখেন, অধ্যয়ন করেন, পরের প্রজন্মকে জানানোর জন্য তা আবার কখনো কখনো লিখেও রাখেন। বন্ধুরা, চাইলে তোমরাও কিন্তু পর্যটক হতে পারো। ভাবছ কীভাবে পর্যটক হবো। তারা তো দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। না বন্ধুরা। পর্যটক হতে হলে শুধু বিদেশেই ঘুরতে হবে এমন কোনো কথা নেই। দেশের ভেতরে থেকেও পর্যটক হওয়া যায়। তোমরা প্রতিবছরই পরিবারের সদস্যদের সাথে দেশের ভেতরেই বিভিন্ন জায়গায় নিশ্চয়ই ঘুরতে যাও। এই ঘুরতে যাওয়াটাকেই তোমরা কাজে লাগাতে পারো। এর পর থেকে তোমরা নতুন যে স্থানেই ঘুরতে যাবে, সেখানে গিয়ে ওই জায়গার মানুষদের ভাষা, জীবনযাপন, সংস্কৃতি, উদয়াপন, উৎসব, বিনোদন, শিক্ষা ইত্যাদি খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবে। প্রয়োজনে ঘুরতে যাবার সময় পকেটে ছোট একটি নোট খাতা আর কলম রাখবে। যা দেখবে তাই তখন তখনই ছোট করে টুকে রাখবে। সাথে দিন-তারিখ আর স্থানের নাম লিখে রাখতে ভুলে যেয়ো না আবার। তারপর বাড়িতে ফিরে সেগুলো একটু সুন্দর করে একটি খাতায় লিখে রাখবে। ব্যস তুমিও হয়ে গেলে পর্যটক।

এবার আমি পর্যটক

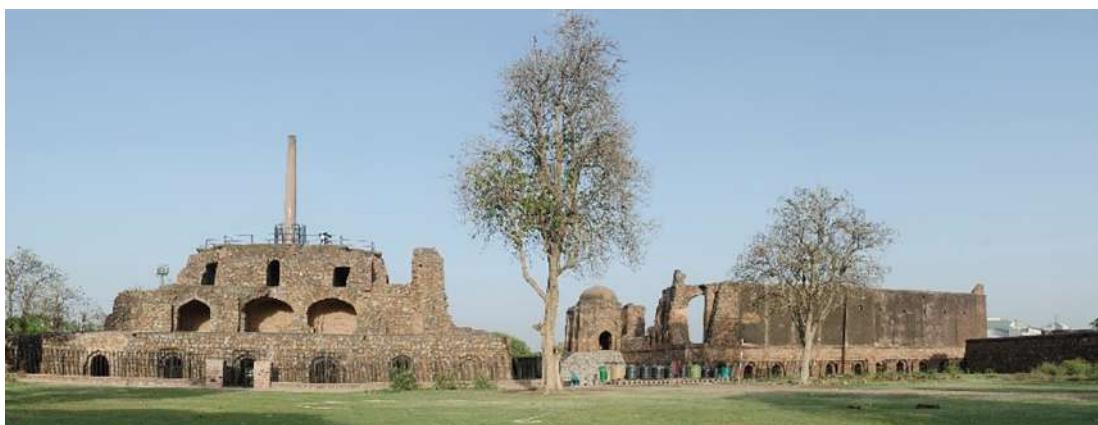
বন্ধুরা, চলো এবার তাহলে মজার একটা কাজ করি। তোমরা কোথায় কোথায় ঘুরতে গেছে সে জায়গাগুলোর নাম লিখে ফেল। তার সেখানকার মানুষদের ভাষা, জীবনযাপন, সংস্কৃতি উদযাপন, উৎসব, বিনোদন, শিক্ষার অবস্থা কেমন দেখেছ তা নিয়ে এক পাতার ছোট একটি রচনা লেখ। তারপর সবার লেখাগুলো নিয়ে একটি দেয়ালে পাশাপাশি লাগিয়ে বানিয়ে ফেল পর্যটকদের দেয়াল পত্রিকা। দেয়াল পত্রিকাটি বিদ্যালয়ের এমন কোনো দেয়ালে টানিয়ে দাও যেখান থেকে চাইলে সবাই পত্রিকাটি পড়তে পারবে।

পর্যটকদের দেয়াল পত্রিকা

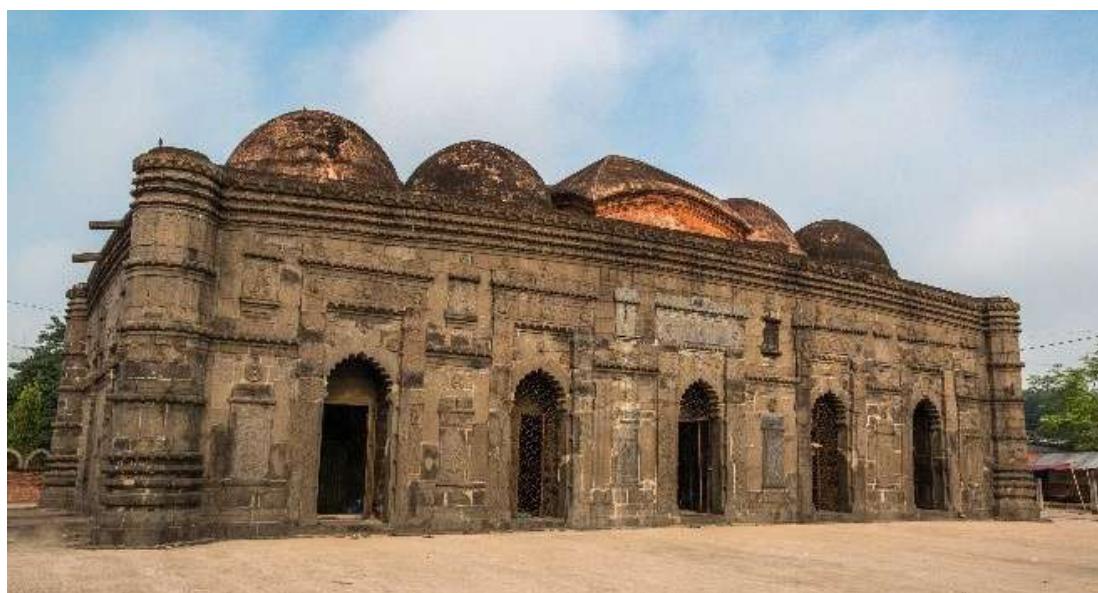
তো আমরা যে কথাটি বলছিলাম। সুলতানি আমলে বিদেশ থেকে আগত কয়েকজন পর্যটকের লেখা থেকে ওই সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এই পর্যটকদের মধ্যে রয়েছেন মার্কো পোলো, ইবনে বতুতা, ওয়াসফ, ভারতেমা প্রমুখ। তাদের লেখা থেকে জানা যায়, সে-সময়ের প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল কৃষিজাত পণ্য, কাপড় এবং মশলা। প্রধান কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ছিল ধান, গম, আখ, ডাল, নারিকেল, সরিষা ইত্যাদি। সাধারণ মানুষদের অধিকাংশই কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করত। সাধারণত নদী ও পানীয় জলাধারের পাশের বৃহৎ অঞ্চলজুড়ে কৃষিকাজ হতো যাতে সেচ সুবিধা পাওয়া যায়। সুলতানি আমলে উৎপাদিত তুলা থেকে যে বস্ত্র তৈরি হতো তা সারাবিষ্ঠে সমাদৃত ছিল। বাংলা অঞ্চলের মসলিনের খ্যাতি ছিল অবিস্মরণীয়। ইবনে বতুতা সুলতানি আমলে বাংলার ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। তাঁর মতে বাংলায় যত সন্তায় জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যেত, তা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যেত না। কিন্তু সন্তায় জিনিসপত্র কেনার মতো সামর্থ্য কতজনের ছিল তা অবশ্য কোনো পর্যটকের লেখায় পাওয়া যায় না। সুলতানি আমলে লেনদেনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত ছিল। সে-সময়ে সোনা, রূপা এবং তামার পয়সার প্রচলন ছিল। তামার পয়সাকে বলা হতো জিতল। তবে সাধারণ মানুষ কড়ির মাধ্যমে বিনিময় করত। সমাজে শ্রেণিবৈষম্য প্রকট ছিল। সমাজের একদিকে যেমন বিত্তবানদের বিলাসী জীবন, ঠিক তেমনি উল্লেখ দিকে সংগামী মানুষ দুমঠো খাবারের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করত।

স্থাপত্যরীতিতে মিশ্রণ ও নতুনত

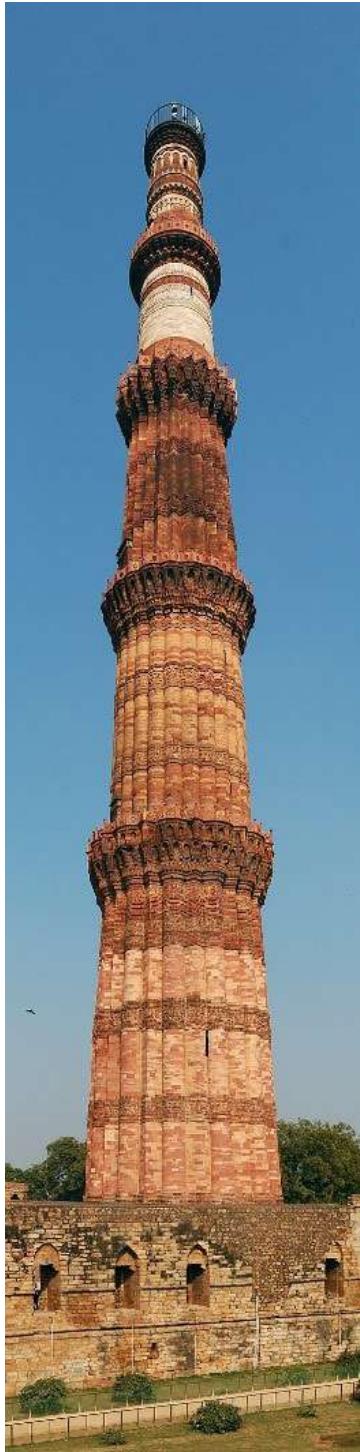
উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতানি আমলের স্থাপত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতি অনেক নতুন কিছুর সাথে পরিচয় ঘটায়। সুলতানদের আগমন এবং সাম্রাজ্য বিভাগের ফলে ইন্দো-ইসলামি রীতির অনুসরণে স্থাপত্য শিল্পের অসাধারণ বিকাশ আমরা দেখতে পাই। এসময় সিরিয়া, বাইজান্টাইন, মিশর ও ইরানের স্থাপত্যরীতির সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের স্থানীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে নতুন একটি ধারা বিকশিত হতে শুরু করে। এই রীতিকে মডেল হিসেবে ধরে কোটলা, ফিরোজ শাহ, হিসার ফিরোজ, ফতেহাবাদ, জেনপুর প্রভৃতি শহর নির্মিত হয়। দিল্লীর কুতুব মিনার, ফিরোজ শাহ কোটলা, তুঘলকাবাদ দুর্গ, আলাউদ্দিন খিলজির মাদ্রাসা, পান্দুয়ার আদিনা মসজিদ, বাগেরহাটের ষাটগঞ্জুজ মসজিদ, খান জাহাস আলীর সমাধি, গোড়ের ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ ইত্যাদি স্থাপনা আজও সুলতানি আমলের স্থাপত্য হিসেবে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। চলো তবে আমরা সুলতানি আমলের কিছু স্থাপনার ছবি দেখে আসি।



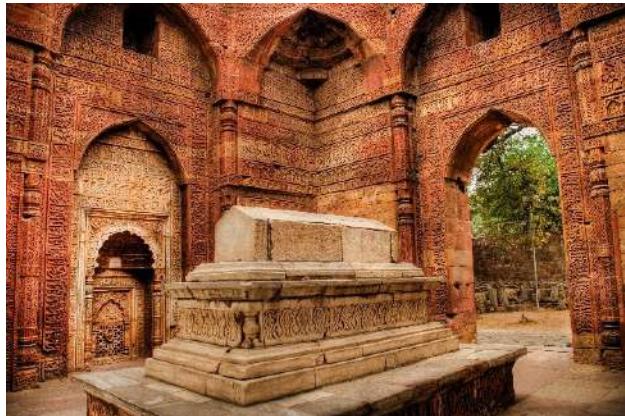
সুলতানি স্থাপত্য : দিল্লীতে অবস্থিত ফিরোজ শাহ কোটলা



সুলতানি স্থাপত্য : গোড়ের ছোট সোনা মসজিদ যা বর্তমানে চাপাইনবাবগঞ্জে অবস্থিত।



লতানি আমলের স্থাপত্য : দিল্লীতে
অবস্থিত ইট দিয়ে নির্মিত বিশ্বের
সর্ববৃহৎ মিনার 'কুতুব মিনার'।



সুলতানি স্থাপত্য : সুলতান ইলতুৎমিশের সমাধি



সুলতানি স্থাপত্য : দিল্লীতে অবস্থিত গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের সমাধি



সুলতানি স্থাপত্য : পশ্চিমবঙ্গের মালদহতে অবস্থিত আদিনা মসজিদ



সুলতানি স্থাপত্য : তুঘলকাবাদ দুর্গ

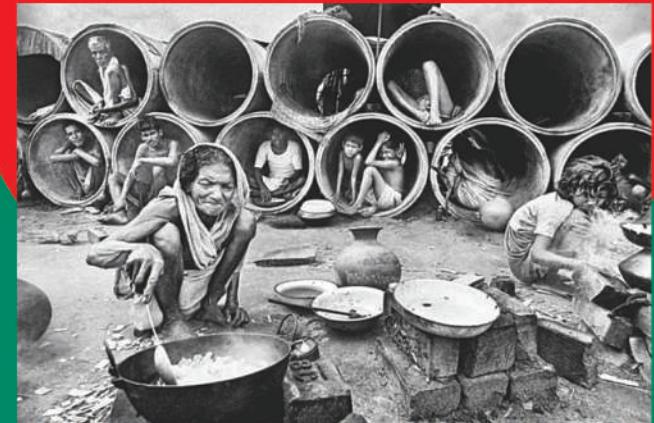
বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ

বাংলাদেশে থাকা সুলতানি আমলের অনবদ্য একটি স্থাপনা বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ। এর গায়ে কোনো শিলালিপি না থাকলেও এর স্থাপত্যরীতি দেখে ধারণা করা হয় আনুমানিক ১৫ শতাব্দিতে খান জাহান আলী এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। ১৯৮৫ সালে প্রাচীন এই মসজিদটিকে ইউনেস্কো 'বিশ্ব ঐতিহাসিক স্থান' হিসেবে ঘোষণা করে। মজার বিষয় হলো, মসজিদটির নাম ষাট গম্বুজ মসজিদ হলেও সত্যিকার অর্থে এতে মোট ৮১টি গম্বুজ রয়েছে।



সুলতানি স্থাপত্য : বাগেরহাটের বিখ্যাত ষাট গম্বুজ মসজিদ





শরণার্থী: ১৯৭১

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের নৃশংসতার হাত থেকে রক্ষা পেতে এদেশের মানুষ বিভিন্ন পথে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় ১০ মিলিয়ন (এক কোটি) শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম -শ্রেণি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অনুসন্ধানী পাঠ

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘটা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য